প্রতিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

প্রতিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদিরাম দাস

নিবন্ধ সূচী

১) প্রতিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ	-	৪
২) রবির চলার কক্ষপথে পালাবদল	-	১৫
৩)যে পথে অনন্ত লোক.....	-	৩২
৪) রবীন্দ্র-ভাবাদর্শে সমাজ ও স্বরাজ	-	৩৮
৫) মানুষের সপক্ষে মহাকবি	-	৪৫
৬) একটি কবিতার একক কবি	-	৫৯
৭) সংগ্রামী জনজাগরণে কবির ভূমিকা	-	৬৪
৮) গণ চৈতন্যের জাগরণে রবীন্দ্রনাথ	-	৭৩
৯) যাদের করেছ অপমান.....	-	৮১
১০) নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ	-	৮৬
১১) নিসর্গ থেকে মানুষের দ্বারে	-	৯০
১২) রবীন্দ্র চিত্তে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া	-	৯৭
১৩) রাশিয়ার চিঠি'র আগে ও পরে	-	১০৩
১৪) রবীন্দ্র সাহিত্য কি আজও প্রাসঙ্গিক?	-	১১৫

প্রতিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ

কথিত হয়, বিশ্বে প্রথম প্রতিবাদবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল আদিকবির কণ্ঠে, ক্রৌঞ্চ হত্যার রূপকে–মা নিষাদ! প্রকৃতপক্ষে এক নারীকে, লুঠে-নেওয়া পণ্যসামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করেছিল যে-বর্বর, তার বিরুদ্ধে। ক্রমে সেই প্রতিবাদ ছড়িয়ে গেল দিগন্তরে, কালে কালে, কাব্যে নাটকে গানে- রাজপ্রাসাদ থেকে দীনতম কুটিরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী গেল কেটে। নিষাদবন্ধু রাম, প্রজাতান্ত্রিক রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কালান্তক রামের প্রশাসন মানুষের স্বপ্নকে অধিকার করে বিলীন হয়ে পড়ল ধর্মের মধ্যে।

ইতিমধ্যে ভারতে প্রারব্ধ হল ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ্য পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার আঁতাত, ধর্মের নামে জাতিবর্ণ বিভাগ তৈরি করে মানুষ-শোষণের পাকাপাকি ব্যবস্থা। বৌদ্ধেরা সংঘাতের পথে গেলেন না, ভক্তিবাদ রইল মাথা নিচু করে, চলল শ্রেণীনির্মিত শাস্ত্র-সহায়ে আরও বিভেদ, আরও নিগ্রহ, আর উচ্চবর্ণের নৃশংস শক্তির আস্ফালন। গেল পাঠান, এল মোগল, কৌশলী ইংরেজ শিবির পাতলে নিরপেক্ষতার ধুয়া নিয়ে, নয়া জমিদারি পত্তনে হল নবজাগরণ, দাঁড়াল শিক্ষিত বিত্তবানদের মতকলহে। জলা ও বাঁশবনে ঘেরা গ্রাম 'কোলকেতা' একশো বছরেই রূপ নিলে রাজধানী কলিকাতার, হয়ে উঠল মুষ্টিমেয় কিছু ভদ্রমানুষের সঙ্গে অজস্র ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও নয়া জমিদারদের বিলাসরঙ্গভূমি। একদিকে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ধারার শিক্ষাদীক্ষা, আচার আচরণ, অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তিতর্ক এ দুয়ের আবর্তে 'কলিকাতা' বৈঠকে ও গলাবাজিতে উত্তপ্ত থাকলেও গ্রাম-অঞ্চল থাকল সামন্ততন্ত্র আঁকড়ে, মূক কৃষককুল নয়া জমিদারদের নূতনতর কৌশলের বেড়াজালে আটকা পড়ে ও ঋণে জর্জরিত হয়ে চলমান শ্মশানের রূপ নিলে। সামন্ততান্ত্রিকতা গেল না, অথচ বুর্জোয়ার আলোছায়া নামল প্রাঙ্গণে।

ব্যবসায়িক স্বার্থ ও জমিদারী লক্ষ্মী নিয়ে এসেছিলেন দ্বারকানাথ, বৈষয়িক ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব রক্ষা করেও ধর্মের দিকে ঝুঁকলেন মহর্ষি, আর অলক্ষ্মী কাব্যসরস্বতী ভর করলেন অন্য ভ্রাতাদের অবহেলা করে বিশেষে রবীন্দ্রনাথের উপর। বয়স হতেই কবির চোখে পড়ল কোলকাতার বিত্তবান্ গোষ্ঠীর একান্ত সংকুচিত বিলাসজীবনে অন্তঃসারশূন্য বাক্যছটা, একশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর গোঁড়ামি চালু রাখার কৌশল, দেখলেন শাসক ইংরেজের প্রভুমন্য স্বেচ্ছাচারীতা, স্বদেশের ফ্যাশনধারীদের ইংরেজ-নির্ভরতা আর স্ব-সম্প্রদায়ের জমিদারদের ইংরেজ-পদাশ্রয়ে প্রজাশোষণের ভূমিকা। একদিকে অর্ধ-অশন অর্ধ-বসন ও সংস্কাররের অন্ধদাসত্বে বিমূঢ় কোটি কোটি গ্রামীণ মুমূর্ষ মানুষ, অন্যদিকে শহরে ধনী ও শিক্ষিতের বিচিত্র রঙ্গশালা।

মানুষ ও কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, এমনকি নিজ পরিবার থেকেও পার্থক্য এই যে, তিনি ছিলেন প্রবলভাবে সমাজমুখী। যদি দৈবাৎ কিছুকালের জন্য আত্মগত প্রেম-সৌন্দর্য-ভাবনায় নিযুক্ত থাকতেন, পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে প্রবলবেগে মুখ ফেরাতেন মানুষের দিকে। নিজগোষ্ঠীর বাইরে বৃহত্তর জনসমাজের মূর্ছিত শোষিত মানুষই তখন তাঁর কাব্যকলার আশ্রয় হয়ে উঠত। খুব সাধারণ কবিদের রচনায় সমাজ-ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ প্রায়ই ঘটে না, সমকালিক ঘটনায় মাঝে মধ্যে চালিত হলেও তাঁরা বেশিমাত্রায় আত্মসচেতন থাকতেই ভালোবাসেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপাত-পৃথক এ-দুই প্রবৃত্তির একটা দ্বান্দ্বিক সমন্বয় ঘটেছিল এবং দ্বিচারিতার বিচিত্র পরম্পরা পার হয়ে অনিবার্য সমুত্তরণ ঘটেছিল নিসর্গ থেকে মানুষে, প্রাচীন থেকে আধুনিক বাস্তবে।

এ বিষয়ে আলোচক ও পাঠক সমাজে আগে-আগে কিছু ভুল ধারণার প্রচার ঘটলেও আজকের আমাদের স্বদেশ নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিন্ত যে, রবীন্দ্রনাথ সমাজ-দেশেরই সুখদুঃখের কবি- অন্ধকার থেকে আলোকে, জড়তা থেকে চলমানতার মধ্যে অগ্রসর করে দেওয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অভিভাবক। কবি একদা নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে আজ থেকে একশো বছর আগেকার কোলকাতার আত্মসুখমগ্ন বুর্জোয়াদের যে- অমোঘ বাক্যবাণে জাগরিত করার প্রয়াস করেছিলেন, তা যেমন কবি হিসাবে রবীন্দ্রের স্বভাবের দিক নির্দেশ করছে, তেমনি স্বদেশের পক্ষে সদাস্মরণীয় ও পালনীয় নীতিবাক্যের রূপ নিয়েছে-

মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ।
স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে,
সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

বস্তুত এই হল জাত মহাকবির স্বভাব। সমাজ ও মানুষের কবি হওয়া ছাড়া মহাকবি হওয়া যায় না। আবার শেষ জীবনে এই কবি মেহনতী মানুষ ও নিরন্ন কিসাণের জীবনের শরিক হতে পারলেন না বলে যে আক্ষেপ বারংবার প্রকাশ করেছেন, তাতে বিপরীতমুখে এটাই প্রমাণ হয় যে, দৃশ্যত বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মানুষ হয়েও তিনি ভিন্ন গোত্রের দিকেই অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। শ্রেণীস্বার্থ তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। আবার এই সঙ্গে তাঁর পল্লী-সংগঠনের দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা একত্র মিলিয়ে দেখলে তাঁকে কেবল মহাকবিই নয়, মহাপুরুষ বলে বিবেচনা করলেও কোনো অসংগতি ঘটে না। এই রবীন্দ্রনাথকেই সরল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে অল্পশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়ীত্ব আমাদের শিক্ষিতদের নিতেই হবে।

উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁসের সমান্তরাল যে মানুষঘৃণ্য, জাতিবর্ণ-সম্বল যে রক্ষণশীলতার আবর্জনা দেশে স্তূপীকৃত ছিল তারই বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ নিয়ে এই কবির প্রকাশ ঘটল, প্রায় সহসাই বলতে হবে, তাঁর একেবারে প্রথম যৌবনে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'ই প্রথম জানালে যে, কবির আত্মলীনতা থেকে মোহমুক্তি অনিবার্য ভাবেই ঘটবে-

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর্ । ওরে, আজ কী গান গেয়েছে পাখি।

এরপর একদিন মৌখিকভাবে স্বাদেশিক এক অভিজাত গোষ্ঠীর সভায় কবিকে একটা গান গাওয়ার অনুরোধ করা হলে কবি ভদ্রতার বিনয় উপেক্ষা করেই তাদের বাক্যমাত্রসার স্বার্থপর চারিত্র্য গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন-

আমার বোলোনা গাহিতে বোলো না।
একি শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা?

শিক্ষিত বাঙালীর বাক্যসম্বল স্বার্থমগ্নতা কবিকে তীব্র আক্ষেপ সহকারে এই সময়েই বলতে প্রেরণা দিয়েছিল-

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!

ত্রিশ বৎসর বয়সে জমিদারির কাজে গিয়ে শোষিত গ্রামীণ মানুষের বাস্তব পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে অন্য মানুষ ও অন্য কবি হয়ে পড়লেন। যা ছিল কেবল শোনার মধ্যে, তার সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ে কবি কী পরিমাণ বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং শিক্ষিত বিত্তবানদের মানসিকতা বদলাবার জন্য কী তীব্র আবেদন রেখেছিলেন, তার স্বাক্ষর রয়েছে- ' এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়-

"ওরে তুই ওঠ্ আজি, আগুন লেগেছে কোথা!"

তাঁর নিজ মহানিষ্ক্রমণের বার্তা সকলের কর্ণগোচর করতে জানালেন-

বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে

জনতার মাঝখানে।

নিরন্ন ঋণভার-জর্জরিত কৃষকদের মর্মস্পশী বর্ণনা দিয়ে বোঝালেন যে, প্রকৃত স্বাদেশিকতা এইখানেই – এই পশু–করে-তোলা মানুষের উদ্ধারে। ইংরেজ শাসকের অমানবিকতার বর্ণনায় বললেন-

বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার।

আর কলিকাতাবাসী ইংরেজ পদাশ্রিত জমিদারদের স্বরূপ চিত্রিত করলেন-

সংকুচিত ভীত ক্রিতদাস লুকাইছে ছদ্মবেশে।

এরকম বলিষ্ঠ জাতীয় প্রতিবাদ এর আগে কেউই উচ্চারণ করেন নি, আর এর পর থেকে লাঞ্ছিত কৃষক-জীবনের জন্য যে-প্রত্যক্ষ সহানুভূতি কবি দেখাতে আরম্ভ করলেন, তা ঐ সময় আর কোথাও দেখা যায়নি। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মানসিক পরিবর্তনের ও বাস্তব মানবিকতা একটি আশ্চর্য দলিল। আর এর সঙ্গে যদি – 'দুর্ভাগা দেশ', 'ওরা কাজ করে' বা 'ঐকতানে'র মতো অন্তত দু'চারটি কবিতাও মিলিয়ে নেওয়া যায়, আর কবির কেবল এই কয়টি কবিতাই বেঁচে থাকে, তাহলেও রবীন্দ্রনাথ নির্যাতিতের নিবিড় সপক্ষ কবি হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

মনীষী কবির প্রবন্ধাবলী পাঠক-সাধারণের ক'জন পড়েন জানি না, পড়লে দেখবেন যে, জাতীয়তার পক্ষে ও সমাজের দিক থেকে সমুচিত হচ্ছে না তখনকার এমন বহু বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে সঠিক পথ নির্দেশ করার জন্যই তিনি লেখনী গ্রহণ করতেন। সুরসিকতামণ্ডিত সাহিত্যিক ও মনোজ্ঞ সেইসব লেখা যেমন পাঠকের হৃদয়গ্রাহী, তেমনি আমাদের পঞ্চাশ-একশো বছর আগেকার সেকাল বিষয়ে যার কিছুমাত্র কৌতূহল আছে, তার সে-কৌতূহলও চরিতার্থ করবে। আর সেসব লেখার বিষয়ের ব্যাপকতাই বা কত বিচিত্র ! হিন্দুয়ানি ও আর্যামি, একদিকে শোষক ও অন্যদিকে খোসামুদে অকাল- কুষ্মাণ্ড জমিদার, বিদেশী রীতির শিক্ষা বর্জন ও মাতৃভাষায় শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা, নেটিভ-ঘৃণাসহ দাম্ভিক ইংরেজের কুশাসন, বঙ্গ-বিচ্ছেদ, গ্রাম সংগঠন, জাতি-বর্ণ-সংকীর্ণতা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, চরকা ও বয়কট বিরোধীতা, দুঃখ ও সংগ্রামের পথে জয়যাত্রার প্রেরণা, আর্থনীতিক সমাজসাম্য, আর পরিশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শোষণের উপর শেষ অভিশাপ বর্ষণ। স্বদেশের এমন কোনো প্রতিবাদযোগ্য বিষয় সেকালে ছিল না, যার বিরোধীতা কবি করেননি।

কিন্তু আজকের এই সংক্ষিপ্ত অবসরে আমরা কবির ছন্দোবদ্ধ বাণীর দিকেই মনঃসংযোগ করছি।

আর্যামি ও হিন্দুয়ানি নিয়ে ছদ্মবিজ্ঞানের সাহায্যে পূজোপার্বণ, ঘণ্টানাড়া, পৈতা, টিকি প্রভৃতির ছেলেমানুষি ও হাস্যকর ব্যাখ্যার প্রত্যুত্তরে কবি বাঙ্গকবিতা লিখেছিলেন বেশ কিছু, ১৮৯০ থেকে দশ বছরের মধ্যেই, 'হিং টিং ছট' যার মধ্যে একটি স্মরণীয় লেখা। এই অবসরেই কবি যেমন ইংরেজ-প্রশাসনের কুৎসিত মূর্তি তুলে ধরেছেন, তেমনি আমাদের সুবিধাবাদী চরিত্রের দিকেও কটাক্ষ করতে ভোলেন নি। যেমন 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, মুষ্টি-প্রহার-খাওয়া মুহুরি যদি ঘুষিটা ফিরিয়ে মারতো তাহ'লে সাহেব আর কাউকেই হাত তুলে মারতে সাহসী হত না। এই বিষয়টি নিয়ে স্বদেশী ও চাকুরিজীবীদের ও ইংরেজ-অনুগ্রহ-প্রার্থী কাগজের সম্পাদকদের উপর কটাক্ষ করে কবি লিখলেন-

'যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান.....
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে.....
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস্‌নে ঢাক।'

এই কথাই আরও প্রবল ভাবে এবং স্পষ্ট বিদ্রোহের সুরে জানালেন নৈবেদ্যের সেই বিখ্যাত কবিতায়-

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছ নিজে.....
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

সাহেবী বেশভূষার সঙ্গে ইংরেজ-পদলেহন তখন লক্ষণীয় ছিল বলেই কবি আক্ষেপ-সহকারে লিখলেন-

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ.....
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কী অহঙ্কার ?

কৃপাপ্রার্থী কাগজের সম্পাদকদের উপর কটাক্ষ করে কবি লিখলেন- শিল্প, স্বদেশের ভাষা ও শিক্ষায় অনুরাগ থেকেই প্রকৃত স্বাদেশিক হওয়া যায়, ইংরেজিতে আস্ফালন ও রাষ্ট্রীয় সভার সভ্য হওয়ার মধ্যে নয়। " ইংরেজের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না।" কবিতা লিখলেন- " ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। মাতৃভাষা অর্থাৎ বাঙলায় শিক্ষার যৌক্তিকতা প্রবন্ধ লিখে প্রতিপন্ন করতে প্রথম প্রয়াস পান রবীন্দ্রনাথই। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত গঠনমূলক স্বাদেশিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। সেইসঙ্গে গ্রাম ও কৃষকের অবস্থার উন্নয়ন, যে বিষয়ে পদক্ষেপ সাম্প্রাতিক পশ্চিমবঙ্গে আজ দ্রুতগতি চলেছে। বঙ্গীয় কংগ্রসের নাটোর সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে প্রতিবাদ জানালেন প্রবীণদের ইংরেজিতে ভাষণের বিপক্ষে, বয়স তাঁর তখন ৩৬-৩৭। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষণ দিয়েছিলেন সব্যসাচী, কিন্তু একহাতে ও একমুখে এত বিভিন্ন রকমের সংকীর্ণতা ও হীনতার বিরুদ্ধে লড়তে আজ পর্যন্ত শুধু সাহিত্যিক নয়, ক'জন একক রাজনীতিক ব্যক্তিকেই বা দেখা গেছে ?

বঙ্গ-বিচ্ছেদের প্রতিবাদে কাব্যকল্পনা থেকে রবীন্দ্রনাথের জনতার মধ্যে নেমে আসা ও ভ্রাতৃভাবের প্রবল প্রেরণা দেওয়া বিখ্যাত ঘটনা। সেই সময় তিনি যেমন ইংরেজ-প্রতিবাদী, তেমনি স্বদেশবাসীর জাগরণে উদ্দীপনা-সঞ্চারী। এই প্রথম ইংরেজ –শাসনের আসল রূপ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তীব্র উদ্দীপনাময় গান গাইলেন- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান' প্রভৃতি। প্রথম জাগরণের ঢেউ এল দেশে, এল প্রবল জোয়ার, কিন্তু সেই প্রথম জোয়ারের ধাক্কায় যেভাবে বিলাতি বস্ত্র পোড়ানো আরম্ভ হল, বিলাতি নুন বন্ধ করা হল, তাতে গরীব মানুষের অসুবিধা হল প্রচণ্ড, বিশেষে মুসলিম সম্প্রদায় গেল খেপে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষায় কবি ফিরলেন। গঠনমূলক ভ্রাতৃত্বের পথে আহ্বান জানালেন- 'সুপ্রভাত' কবিতায়- 'রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া'। সমাপ্তিতে আশা প্রকাশ করলেন যে, এই অপ্রত্যাশিত কলহে উভয় সম্প্রদায়েরই চোখ খুলে যাবে, তারা নিজের স্বার্থ কোথায় তা বুঝে নিয়ে একযোগে পল্লীসংগঠনে আত্মনিয়োগ করবে- 'মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে'। ঘরে-বাইরে উপন্যাসেও তিনি এই সহসা-আগত সাম্প্রদায়িক বিভেদের দুঃখজনক পরিণাম চিত্রিত করলেন। হিন্দু-মুসলিম মিলন নিয়ে এখন থেকে সমাজের গুরুতর প্রয়োজনে লিখে চললেন অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

স্বাদেশিকতা বিষয়ে কবির একটা স্বকীয় মৌলিক অধ্যয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেটা এই যে, গ্রাম-স্বরাজ গড়ে তোলার সূত্রে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করায় অভ্যস্ত হলে পরে ইংরেজ, সরে গেলে দুই সম্প্রদায় মিলে অনায়াসে দেশ চালাতে পারবে।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল এই যে, আমাদের নিজের মধ্যে দুর্বলতা না থাকলে তৃতীয় পক্ষ এর সুযোগ নিতে পারত না। তিনি দেখেছিলেন, জাতিবর্ণে এবং ছোঁয়াছুঁয়ির অভিশাপে সংকীর্ণ হিন্দুসমাজের মধ্যেই মানুষে-মানুষে ভেদ টানার বিষ-বীজাণু রয়ে গেছে। এর জন্য কী প্রবন্ধে কী কবিতায় পুঞ্জীভূত কুসংস্কারে ভূতগ্রস্ত অচল হিন্দু সমাজকে তীব্র কশাঘাতে জাগরিত করতে প্রয়াস করেছেন বারংবার। সংগ্রামের ধূলি- ধূসরিত পথ বরণ করে অন্তরে মুক্ত না হলে বাইরের মুক্তি দুর্লভ হবে, এই অনুভব ছন্দায়িত করেই তিনি লিখলেন-

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা –স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ড দণ্ড ক্ষয়।

যে তরুণেরা দেশের আশাভরসা, তারাও অন্ধতার বেড়াজালে আটকে পড়ে অদৃষ্ট-নির্ভর বিমূঢ় জীবনযাপন করে চলেছে দেখে তাদেরও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে কর্মের পথে উৎসাহিত করার জন্য এই সময় চিরস্মরণীয় একটি কবিতা রচনা করেছিলেন কবি-

কিসের তরে অশ্রু ঝরে
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস.....
যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা
তোমার যত ভৃত্যগণে.....

জাতিবর্ণ ভেদের শাস্ত্রীয় মার্কা বুকে এঁটে নিম্নবর্ণকে নিপীড়িত-শোষিত করে রাখার জাতীয় হীনতা সাম্প্রদায়িক বিভেদের মতোই কবির চিত্তকে পুনঃপুন আঘাত

করেছে। বস্তুত বাঙালী ও ভারতীয়ের দৃঢ় সংস্কারে জট-পাকানো এই দুই হীনতার বিরুদ্ধেই কবির লেখনীতে সব থেকে বেশি প্রতিবাদ-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এই অর্থে 'অপমান' কবিতার-

যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।.....
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এস,
নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।

এবং সেই সঙ্গে 'অচলায়তন' নাটকে চিত্রিত হীনবর্ণের সংগ্রাম সহায়ে মুক্তি- "না যদি কুলোয়, তাহলে এমনি করে দেয়াল আর একদিন ভাঙতেই হবে"। আর 'তাসের দেশ' নাটকের সেই ঐতিহাসিক উজ্জীবনমন্ত্র- " বাঁধ ভেঙে দাও,- জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক"- এসব একসঙ্গে গ্রথিত করে রবীন্দ্রনাথের সামূহিক প্রতিবাদী চিত্তের স্বরূপ বুঝতে হবে।

এল প্রথম মহাযুদ্ধ, হল সবুজপত্রের সূচনা। কবিকণ্ঠে নোতুন করে আরো প্রবলতার সঙ্গে স্ফুরিত হল জাতির জড়ত্ব নিঃশেষে দূর করার উদ্বোধন। কবি দেখলেন, পুরানো সংস্কারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে এমন অকালবৃদ্ধের দলকে দিয়ে অগ্রগতির কিছুই হবে না, তাই নবীন ও যৌবনকে অভিষিক্ত করলেন তাঁর স্বপ্নের ভাবী স্বদেশের জন্য- " আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা"। এক্ষেত্রে কবির প্রতিবাদ হল মানসিক জরার বিপক্ষে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, আর অভিনন্দনের বাণী উচ্চারিত হল সর্ববিধ সংগ্রামের সপক্ষে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঘটনাকে কবি নোতুন জীবনের প্রতীক হিসাবেই বরণ করে নিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন এর ফলে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও শোষণের জড় বিধ্বস্ত হবে, আর সেই পরিবর্তন ভারতের মুক্তিও সম্ভব করে তুলবে। এই কারণেই সংস্কারে বিমূঢ় দেশবাসীকে প্রস্তুতি হিসাবে নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর না হওয়ার জন্য ধিক্কার দিলেন-

দূর হতে কী শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন
ওরে দীন, ওরে উদাসীন।.....

শান্তিনিকেতনের উপাসনার বেদী থেকেও জানালেন- ইয়োরোপের লড়াইয়ের দৃষ্টান্তে আমাদেরও সংগ্রামে নামতে হবে। আমাদের লড়াই হবে নিজের সঙ্গে,

সংকীর্ণ স্বার্থপূর্ণ কুসংস্কারের যে ভূতটা যুগ যুগ ধরে আমাদের শাসন করে চলেছে,তার সঙ্গে। ভাষণে বললেন, শ্রেণীস্বার্থের সঞ্চয় যখন প্রবল হয়ে মানবতার পথ রোধ করে, তখন অনিবার্য প্রয়োজন হয় সংগ্রামের। লিখলেন, ইতিহাস-বিধাতাকে ইতিহাসের বেড়া যুগে-যুগে ভাঙতে হয়- "তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায়, তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে। সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়, তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে থাকে, সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয় তবে মুক্তি"।

মহাযুদ্ধের পরই দেখা দিলে দেশে অসহযোগের বন্যা। গান্ধীজী স্বকীয় ধারণা অনুসারে নোতুন আন্দোলনের সূত্রে দেশকে জাগালেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চরকা ও বয়কটকে নব্য সংকীর্ণতা ও নেতিবাচক আন্দোলন বলে অভিহিত করলেন, সমর্থন করতে পারলেন না, গঠনমূলক স্বাদেশিকতা অর্থাৎ গ্রাম-সংগঠনের পথেই অবিচল থাকলেন। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদীর জঘন্য পশু-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল জালিয়ানওয়ালার হত্যাকাণ্ডে। এ বিষয়ে রাজনীতিকেরা নীরব থাকলেও এ অত্যাচার কবি কোনোমতেই সহ্য করতে পারলেন না, আত্মগ্লানির আগুনে দগ্ধ হয়ে ইংরেজের দেওয়া 'স্যর' খেতাব বর্জন করলেন। প্রতিবাদের চূড়ান্ত নজির রাখলেন স্বদেশে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় গিয়ে এই জঘন্য নৃশংসতার বিরুদ্ধে সেখানকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিবাদ দাবি করলেন, পেলেন না, তাঁরা মুখ অবরুদ্ধ করে রইলেন।

কিন্তু এই অত্যাচার কবির সুপ্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল। ১৯০৫-এ তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমেছিলেন এবং ফিরেছিলেন, কিন্তু এবার আর পিছিয়ে থাকতে পারলেন না এবং এর পর থেকে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী জঘন্যতার প্রতিবাদ করতে আর একটুও দ্বিধা রাখলেন না। হিজলির কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দীদের হত্যার প্রতিবাদে দাঁড়ালেন মনুমেণ্টের পাদদেশে, সংশয় প্রকাশ করলেন – অহিংসার জয় ও সত্যের জয়ে চিহ্নিত কাল্পনিক ঈশ্বরবোধের উপর। এ-বিষয়ে কবির চিরস্মরণীয় কবিতা হল-

'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে'

নিষ্ঠুর বাস্তবে জাগরিত হয়ে কবি অন্তর থেকে মুছে ফেলে দিলেন বিতর্কিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব- নাস্তিত্বের ধারণা-

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো-
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ-

কবির এ প্রশ্ন নয়, প্রশ্নকারে উপস্থাপিত অত্যাচারের মুখে দয়াময়-সত্যময় ঈশ্বরের সংস্কার বর্জন।

পশ্চিমের মানুষ-বিরোধী যান্ত্রিক সভ্যতা, বিশেষত আমেরিকার ধনতান্ত্রিকতায় বিরুদ্ধে আমরা স্বদেশে আমাদের কবিকেই দেখলাম একটি পরিপূর্ণ প্রতিবাদের ছবি আঁকতে, মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটকে। সমাজনৈতিক প্রতিবাদের সঙ্গে যোগ করতে ভুললেন না মানবতার বীর সৈনিক ও শোষণের অভিশাপগ্রস্ত শ্রমজীবীদের শহীদ হওয়ার গৌরব। কবির উপলব্ধি হল, ধনতন্ত্রের নিষ্ঠুর উন্মত্ততা, মানুষের রক্তের বিনিময়ে পণ্য- উদ্‌গার সৃষ্টির পক্ষে কদাচ স্বাভাবিক নয়, এ আপনা থেকেই অভিশপ্ত, কিন্তু এর ধ্বংসের জন্য শ্রমিকপক্ষেও আত্মদানের প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। কবিসত্তার সঙ্গে কবির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যোগের ফলে তাঁকে এই সত্য পরিস্‌ফুট করতে হল যে, মেহনতী মানুষ ছাড়া যন্ত্র, রাষ্ট্র, বাণিজ্য, পণ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতির আস্ফালনসহ যে রথযাত্রা দিগ্‌বিদিকে চালু করা হয়েছে তার চাকা অচল হয়ে পড়বে।

কালের যাত্রার রথ উধাও হয়ে ছুটেছে, আর তারই সমতালে ছুটেছেন আমাদের প্রগতিশীল আধুনিকতম কবি। ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ যেমন আধুনিক, ১৯১৪ সালে তেমনই আধুনিক, আর ১৯২৩-২৪ এর পর থেকে আধুনিকতম। জানা যায় না, বলশেভিক বিপ্লবের সংবাদ ও তত্ত্ব ঠিক ঐ সময়ে কবির মনে কোনো রেখাপাত করেছিল কি না, কিন্তু এটা নিশ্চিত, তিনি অদম্য কৌতূহল বহন করে চলেছিলেন যে, মানুষের মুক্তির বাস্তব রূপ একদিন তাঁকে স্বচক্ষে দেখে আসতেই হবে। তাই পিছনের দিকে-ফেরানো-মুখ বান্ধবদের সাবধান-বাণীকে উপেক্ষা করে যেদিন তিনি এই মুক্তি প্রত্যক্ষ করলেন, সেদিন তাঁর প্রথম অনুভূতি হয়েছিল যে, তিনি তীর্থ দর্শনে এসেছেন।

দেখলেন, সেখানে ব্যক্তিগত ধনের অহমিকার স্থান গ্রহণ করেছে সামাজিক কর্মে আত্ম- উৎসর্গ –আর কী তার স্ফুরিত দীপ্ত গতিবেগ! ১৯৩০-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের কবি হিসাবেও যেটুকু আভিজাত্যের দাবি ছিল, তা তিনি ছুঁড়ে ফেললেন। অনুভব করলেন যে, প্রতিনিয়ত অনিশ্চিত অবস্থার কর্মী মানুষের তিলে

তিলে আত্মদানের জীবন তো তাঁর হয়নি- 'অপরিস্ফুটতার অসম্মান' নিয়েই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। মুক্তমনে স্পষ্টভাবেই জানালেন যে, কিসান ও মেহনতী মানুষের জীবন তাঁর হয়নি, সুতরাং তাঁর কাব্যেও এ-বিষয়ে কোনো পরিচয় ফোটে নি- এই অপূর্ণতাকে সঙ্গী করেই তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। কবির এই পরিণামী মানবিকতার তুলনা নেই। তখনও ছিল না, আজও কি সর্বত্র আছে ? মহাকবির সূত্র ধরে কোন কবি আজ এতো স্পষ্ট ,কারাই বা নিঃশেষে মুক্ত? এরকম বাস্তবভাবে মানবিক যাঁর চিত্ত, তিনি শেষ জীবনের কাব্য-কবিতায় মুহুর্মুহু নিপীড়িত মানুষের বিবরণ গ্রথিত করবেন, এ স্বাভাবিক। কিন্তু এরই সঙ্গে তাঁর একালের কবিতায় দুই পৃথক শ্রেণীর মানুষের মূর্তি এবং সেই সঙ্গে তাঁদের পৃথক অবস্থানের স্বরূপ যে ফুটে উঠেছে এটাই হয়েছে লক্ষণীয়, যেমন-

মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন-অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে।

নিগৃহীত মানুষের জন্য আন্তরিক মর্মবেদনা কবিকে বিগলিত করেছে এবং তাঁর নিজের আভিজাত্যের জন্য গ্লানিবোধ এনেছে ঠিকই, কিন্তু শেষের দিনগুলিতে তাঁর প্রতিবাদ-বাণী স্তব্ধ করেনি। তাই দেখি, যেদিন ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে প্রায় বহিষ্কার করা হল এবং কংগ্রেসের হিটলারি শাসনের গৌরব কীর্তন করা হল, সেদিনও যেমন কবি নিশ্চুপ থাকতে পারেন নি, তেমনি শিশুঘাতী- নারীঘাতী ফ্যাসিস্ট আক্রমণগুলি সম্পর্কেও। আবিসিনিয়া, স্পেন, চীনে পরপর অভিযান ও নির্বিচার নরহত্যার কদর্যরূপ যেমন তাঁকে পরিক্লিষ্ট করেছে, তেমনি অভিশাপ-বাক্যও উচ্চারণ করিয়েছে কঠোরতম ভাষায়। একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন সম্পর্কেও কবি প্রকাশ করেছেন তীব্র ঘৃণাপূর্ণ শেষ উপলব্ধি ক্রুদ্ধ স্বাক্ষর – তাঁর ' সভ্যতার সঙ্কট' নিবন্ধে ও র‍্যাথ্‌বোনের নির্লজ্জ ভারতনিন্দার ও ইংরেজ-মহিমা-ঘোষণার প্রতিবাদে। মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে স্বাক্ষরিত এই প্রতিবাদই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কবি চল্লিশ বছর আগে যে-প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তা অক্ষরে অক্ষরেই পালন করে গেছেন-

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে ..... যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম।

-o-

রবির চলার কক্ষপথে পালাবদল

পালাবদল, একেবারে যাত্রাবদল নয়। যেমন পথে-চলা পথিককে ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরতে হয়, যেমন পার হতে হয় দুর্গম গিরিকান্তার-মরু। সেই সব নোতুন অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে পথিকের চিত্ত। একই মূল গঠনের মধ্যে তার নব নব রূপান্তর ঘটে। আর এই পথিক যদি কবি হয়, বর্ণে ছন্দে তাঁর প্রকাশশক্তি থাকে তাহলে পথের এই ঘুরফির আর সুখদুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর চিত্তে ছায়াপাত করে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বকে নানান বর্ণে অনুরঞ্জিত করে থাকে। এরই জন্য কবি সম্প্রদায়ে কেউ একই বিষয় নিয়ে সব কবিতা লেখেন না, কালে কালে তাঁদের কাব্যে রূপরসের বদল হতে থাকে। সাধারণ মানের কবিদের পক্ষে যা সত্য তা মহাকবির পক্ষে সত্যতর। বিশেষে রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর কল্পনাশীল ও বহু-বিচিত্র-অভিজ্ঞতাময় সুদীর্ঘ-কাব্যজীবনবাহী কবির পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের মহাগীতিকবিও বটেন, আবার সেই সঙ্গে ভাব- প্রেরণা-চালিত মহা মনস্বীও বটেন। কল্পনা ও বাস্তব, নিসর্গ ও মানুষ, নগর ও গ্রাম, বিশ্ব ও স্বদেশ, পৃথিবী ও মহাকাশ, প্রাচীন বর্তমান ও ভাবীকাল তাঁর কাব্যে নাট্যে গানে এত বিচিত্র মূর্তি ও এমনই চিত্তাকর্ষক ভাষার ইঙ্গিত নিয়ে রয়েছে যে তিনি এক অপরিমেয় বিস্ময়ের উৎস হয়ে আছেন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে। আর, নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক ব্যক্তিত্বকে সমন্বিত করে কালের যাত্রার ধ্বনি কান পেতে শুনে তিনি যে-বৈপ্লবিক নূতনের বিজয় ঘোষণা করেছেন, পুরানো সংস্কারে বন্দী এই জাতিটা তার মহিমা উপলব্ধি করতে আজও অক্ষম হল। পরিবর্তনই সত্য, পুরাতন জীর্ণ হয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে, সৃষ্টিতে চিরনূতনেরই জয়, এ তত্ত্ব পৃথিবী ও মহাকাশের নিসর্গ থেকে সঞ্চয়ন করে কবি আমাদের উপহার দিলেও তা মান্য করি নি, এতই জড়চরিত্র এতই সংকীর্ণ আমরা।

নূতন, চির নূতন- তুমি বারেবারেই নূতন, তুমি ফিরে ফিরে নূতন –কবির প্রৌঢ় বয়সে উপলব্ধ এই বৈপ্লবিক চৈতন্য তাঁর প্রায় অগোচরেই বলতে হবে, তাঁর কাব্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে ভাব থেকে ভাবান্তরে রূপ থেকে রূপান্তরে নিয়ে গেছে। একই রবীন্দ্রনাথ ধরেছেন নানা রবীন্দ্রনাথের একটি মালা, কিভাবে তার সূত্র

অনুসরণ করে দেখা আর এক বিস্ময়। কিছুটা ধরতে গেলে আমাদেরই প্রত্যক্ষের মধ্যে যে সব নিসর্গ-বস্তু রয়েছে তার সঙ্গে নিত্য চলমান এই কবির স্বভাবের উপমান সন্ধান করে দেখতে হয়। আর সেক্ষেত্রে খর বেগে প্রবহন্তী একটা মহানদী, ধরা যাক পদ্মারই সঙ্গে কবির সমানধর্মতা সহজেই চোখে পড়ে। কবি নিজেও পদ্মার সঙ্গে তাঁর সখ্য এবং খরস্রোতা নদীর সঙ্গে তাঁর চঞ্চল মনোধর্মের তুলনা করেছেন। তুলনাটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে দেখা যেতে পারে। উৎসের চারপাশে চিররহস্যাবৃত অচঞ্চল স্তব্ধ হিমগিরি- ভারতীয় জীবনসত্যের ইঙ্গিতবাহী, সমুচ্ছ্রিত তুঙ্গশৃঙ্গনিচয়ে মহাকাশ-স্পর্ধী। আর নিচে অজস্রধারায় কলমন্দ্রিত হয়ে চিত্রিত প্রকৃতি ও কোলাহলমুখর জনতার সাহচর্য নিয়ে ছুটে চলেছে তরঙ্গিণী, পিছনকে ফেলে এগিয়েই চলেছে, মাঝে মাঝে প্রতিহত হয়ে আবর্তে, ফেনার, তটবিঘাতী স্রোতে উদ্দাম হচ্ছে মলিন হয়ে, আর পরিশেষে আত্মসমর্পণ করছে আর এক রহস্যময় মানুষ-চৈতন্যের মহাসাগরে।

উনিশ শতকের নব-বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের কেন্দ্রভূমি কোলকাতা, তারই বিশিষ্ট বিন্দু ঠাকুর-পরিবার। ভারতীয় প্রাচীন এবং ইয়োরোপ প্রভাবিত আধুনিক সামাজিকতা ও সংস্কৃতির মেশামেশির অঙ্গন। এরই সাহিত্যিক দিক- নব্য রোম্যান্টিকতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশ। চিন্তায় বচনে ধর্মকর্মে বাঙালী সমাজের সাধারণ মানসিকতার সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের বিশেষ পার্থক্য যদিও ছিল না, তবু অর্থে মানে অগ্রগণ্য থাকায় এক ধরনের পরিশীলিত রুচি, এক রীতির রক্ষণশীল শুচিতা বহু-শাখায়িত ঠাকুর-পরিবারের চাল-চলন নিয়ন্ত্রিত করত। ঐ উচ্চ –মধ্যবিত্ত স্বতন্ত্রতার নিয়ামক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ; আর তাঁর পুত্র পৌত্রেরা আধুনিক দৃষ্টিকোণ সহ কিছুটা পার্থক্য রক্ষা করেও মোটামুটি ঐ পারিবারিক কেন্দ্রেই আবর্তিত ছিলেন। মধ্যবিত্তের সমাজ-জীবনে স্বাধীন ও উন্নত শিল্পকলাচর্চার যে বিশিষ্টতা তা নিয়েই ঠাকুর-পরিবারের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এরকম পরিবারের ধারাবাহী হয়েও সীমাহীনভাবে আত্মবিস্তার করতে পেরেছিলেন- যেমন সূক্ষ্ম কল্পনার আকাশে , তেমনি সাধারণ মানুষের অভিমুখে। এই বিস্তৃতির জন্যই তিনি আত্মমুখী গীতিকবি হয়েও বহির্মুখ মহাকবি।

তাঁর প্রথম কাব্যজীবনে নিতান্ত আত্মলীন অবস্থার পর্যায় কেটেছে আত্মীয়-পরিজনের মিলন-বিরহ- খেলায়, নন্দন-মন্দারের উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্নবিলাসে, সেই , "বকুল-মুকুল-আকুল কুঞ্জভবনে"। কবির কথায়-

কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,

তার মাঝে বসে করি কল্পমধু পান,

বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া,

তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান।

রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি,

আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী। (কড়ি ও কোমল)

অথবা, প্রেমিকার হৃদয়-আকাশের নিঃসীম বিজনতার রহস্যে পাড়ি দিতে সোনালী ডানা বিস্তার করতে চাওয়া-

তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন,

বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,

যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার

আমার দু'খানি পাখা কনক-বরণ! (ঐ)

অতি লোভনীয় রম্য অভিলাষ সন্দেহ নাই, তবু এই স্বজন ও পরিচিত পরিবেশের বিমূঢ় পরিতৃপ্তির মধ্যেও কবি কষ্টবোধ করেছেন, একান্ত আত্মলীনতা থেকে নিষ্ক্রমণ চেয়েছেন বারংবার। কেন চাইছেন অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি, কেন শ্রেয় মনে করেছেন শান্তিস্বস্তির গৃহবন্ধন থেকে উৎক্রান্তি, তার পরিচয় নিহিত রয়েছে তাঁর বিশিষ্ট কবিস্বভাবের মধ্যে, যার প্রভাবে গৃহলীনতা থেকে সমাজমধ্যে, নিসর্গ থেকে মানুষে এবং সৌন্দর্য থেকে বাস্তবে সমুত্তরণ কবির পক্ষে অনায়াসেই নির্বাহিত হয়েছে। এই কারণে তাঁর প্রাথমিক আত্মগত কল্পনার জালে বন্দী অবস্থার মধ্যেও চকিতে বিশ্বমুখী ও মানবমুখী হওয়ার প্রবল বাসনা-বিক্ষোভ ছন্দিত হয়েছে-

আজি চারিদিকে মোর

এ কী কারাগার ঘোর!

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা,

আঘাতে আঘাত কর্।

এবং সেইসঙ্গে-

গগনে পবনে সাগরে আজিকে

কী কল্লোল!

দে দোল্ দোল্। (ঝুলন)

ক্রমে জীবনের অভিজ্ঞতায় কবি দেখলেন যে বিশ্ব চলমান, স্বার্থ নিয়ে আত্মনিহিত থাকার কোনো পথই আমাদের নেই। তুলনায় দেখালেন-

এ নহে মুখর বন-মর্মর- গুঞ্জিত,

এ যে অজাগর- গরজে সাগর ফুলিছে;

এ নহে বনানী কুন্দ-কুসুম-রঞ্জিত,

যেন- হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।

সুতরাং মুক্তপক্ষে বিহঙ্গের মত অজানা জনতার মাঝে নিরুদ্দিষ্ট দুঃখের জীবনই তাঁর কাম্য হল-

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন

উষা দিশাহারা নিবিড়- তিমির-আঁকা।

প্রথম বেদনার মধ্যে দ্বিধা এবং পরে মানুষের অভিমুখে নিঃসংশয় পালাবদলকে কবি আপনার অজ্ঞাতে অর্থাৎ নিগূঢ় স্বভাববশে কিভাবে স্বকীয় করে নিতে বাধ্য হলেন সে বিষয়ে তাঁর পরিস্ফুট মর্মকথা পাওয়া যাচ্ছে তাঁরই ব্যক্তিত্বের চিত্রবাহী জীবনদেবতা-শ্রেণীর একটি কবিতায়-

এ কী কৌতুক নিত্য নতুন

ওগো কৌতুকময়ী,

আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে

বলিতে দিতেছ্ কই?

অন্তরমাঝে বসি অহরহ

মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ

মিশায়ে আপন সুরে।

কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,

তুমি যা বলাও আমি বলি তা-ই,

সংগীত-স্রোতে কূল নাহি পাই,

কোথা ভেসে যাই দূরে।

কবি ভেবেছিলেন তাঁর আশপাশের প্রিয় পরিজনের সুখদুঃখ মিলনবিরহ নিয়েই সারাজীবন কাটাবেন। কিন্তু বিধি বাদ সাধলেন। কবিকে আসতে হল জমিদারির কাজে, নিঃসম্বল ও ঋণগ্রস্ত কৃষক প্রজাদের মাঝে, যার ফলে তাঁর কবিতার নিতান্ত আত্মলীনতা এবং মায়াস্বপ্ন গেল কেটে। এখন থেকে সংগ্রামী দুঃখী মানুষের বেদনা-কাহিনী আত্ম-অবরুদ্ধতা চূর্ণ করে তাঁকে নূতন পথে, মানুষের সমাজে নিয়ে আসতেই কল্পনার বদল হল অনেকটা তাঁর অগোচরেই। এরই বিষয় কবির ঐ আত্মজীবন-ইতিবৃত্ত-মূলক কবিতাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে-

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন

ওগো কৌতুকময়ী,

যে পথে পান্থ্ চাহে চলিবারে

চলিতে দিতেছ্ কই? .....

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,

কোথা যাব আজ নাহি পাই ঠিক,

কান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক

এসেছি নূতন দেশে।.....

কভু বা পন্থ গহন জটিল,

কভু পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল,

কভু সংকট-ছায়া-শঙ্কিল

বঙ্কিম দূরগম।

খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,

ধুলায় রৌদ্রে মলিন বরণ,

কবি এখানে নিজেই উপলব্ধি করেছেন যে, জীবনের পটপরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর কবিতাও ঋতু-পরিবর্তন ঘটেছে, আত্মলীন কল্পনার রাজ্য থেকে মানুষ-সমাজের মধ্যে আসায় তাঁর কাব্যে তাঁর অজ্ঞাতে অথচ অনিবার্যভাবেই এক রূপান্তর ঘটে গেছে। এই ইতিবৃত্ত রচনার পূর্ব অধ্যায়ে রয়েছে সেই আশ্চর্য পরিবর্তনের ভাবব্যাকুলিত প্রত্যক্ষ চিত্র- 'এবার ফিরাও মোরে' নামের অত্যন্ত স্মরণীয় কবিতাটিতে-

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে

হে কল্পনে, রঙ্গময়ী।

নিজের জড়ত্বের বিরুদ্ধে ভারী তীব্র মানবিক কবি নিজেই বিদ্রোহ করে আহ্বান জানিয়েছেন-

ওরে তুই ওঠ আজি। আগুন লেগেছে কোথা।

এই হল গ্রামে জমিদারির কাজ করতে এসে মূঢ় ম্লান মূক হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের দূরবস্থা দেখে কবির রূঢ় বাস্তবকে নির্দ্বিধায় বরণের ইতিবৃত্ত-

কবিজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ একান্ত বাস্তব সত্য। বাঙলার চিরদুঃখী কৃষকজীবন বাঙালীর তথা ভারতীয় ইতিহাসের যুগ যুগ ব্যাপী শোষণের প্রত্যক্ষ করুণ দৃষ্টান্ত-রাষ্ট ও সমাজের অনপনেয় কলঙ্ক। রবীন্দ্রনাথের আগে অবশ্য এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, কিন্তু নিজের চোখে প্রতিদিন দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতা কবি-চিত্তকে যে- অপরিসীম দুঃখ-বেদনায় দীর্ণ ও দুরূহ কর্মে প্রবুদ্ধ করে তুলেছিল তার তুলনা হয় না। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা রবীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক চিত্ত-পরিবর্তনের একটি অসামান্য দলিল। কোথায় কাল্পনিক কবিতা, আর কোথায় বাস্তব দুঃখে জীর্ণ হতভাগ্য মানুষ! এই দুই বিপরীতকে মেলালেন আমাদের কবি। যার ফলে এরপর থেকে স্বার্থপর দীনতার ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য এবং ধুলায় লুণ্ঠিত মানুষকে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কবিকণ্ঠে বারংবার শোনা গেছে আবেদন, কখনও উদাত্ত স্বরে কখনও বিলাপের করুণ পূরবীতে। ঐ একই সময়ে কবি প্রবৃত্ত হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নির্যাতনের প্রতিবাদে। 'সাধনা' পত্রিকায় ক্রমাগত লিখে গেছেন-ইংরাজের আতঙ্ক, ইংরেজ ও ভারতবাসী, অপমানের প্রতিকার, রাজা ও প্রজা, রাজনীতির দ্বিধা প্রভৃতি প্রবন্ধমালা। এইভাবে কবির কল্পনাকুল আত্মসংবৃত অবস্থা থেকে মুক্তির সূচনা ঘটেছে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরে, তাঁর চিত্রা-কাব্য রচনার অধ্যায়ে। কবি নিজে তাঁর এই নোতুন অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করে আত্মজীবনীতে লিখছেন-

'এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল ..... যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিলে? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।'

'বর্ষশেষ' কবিতা থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়ে কবি তাঁর সংগ্রামের পথে ফেরার নিঃসংশয় চিত্রের অবতারণা করেছেন এই বলে-

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল .....
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,

করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।
চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক। (বর্ষশেষ)

রবীন্দ্রকাব্যে কল্পনা ও বাস্তব এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক চিত্র আগাগোড়াই লক্ষণীয়। তিনি নিসর্গ অথবা প্রাচীন ভারত যে বিষয়ে যখনই কল্পনায় নিয়োজিত হয়েছেন, সেই মুহূর্তে সংগ্রামী বাস্তব জীবন তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে পথের ধুলায়। দেখা যায়, স্বদেশে অথবা পৃথিবীতে রাষ্ট্রিক অথবা সামাজিক জীবনে যে সব প্রতিঘাত এসেছে, তাঁর কোনটিই তাঁর অন্তরঙ্গ স্বীকরণ থেকে বঞ্চিত হয় নি। এরই ফলে রবীন্দ্রনাথ চির-আধুনিক কবিরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

পদ্মাতীরবাসে কবির নিসর্গসখ্য ও গ্রামপ্রীতি- উৎসারের একটি অধ্যায় রক্ষিত হয়েছে সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালিতে; অন্যটি গ্রামজীবন-ভিত্তিক গল্প রচনায়। এগুলি মানুষ-সম্পর্কের সাহিত্যিক গ্রন্থনের মূল্যবান দৃষ্টান্ত, নিরুত্তাপ সহজ জীবনপ্রবাহের রমণীয় করুণ-কোমল ছবির মেলা- সহানুভূতিতে পরিষিক্ত, মানবিক কলধ্বনিতে মুখর। কবির বিরহিত সৌন্দর্য-অভিলাষের পূর্ণ পরিতৃপ্তিও আবার এই একই পর্যায়ে, কল্পিত প্রিয়ার সঙ্গে মিলন-বিরহের প্রদোষ-সংগমে –

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

বস্তুতঃ কল্পনা-প্রেরিত রবীন্দ্র-কবিদৃষ্টির মধ্যেই দ্বিচারীতা স্পষ্ট। তাঁর কবিজীবনের আদান্ত এই দুই প্রান্তে দোল খাওয়ার এক বিশিষ্ট ইতিবৃত্তের স্বাক্ষর বহন করছে। তবু ক্রমশ সমুত্তরণ ঘটেছে কল্পনা থেকে বাস্তবে, নিসর্গ থেকে মানুষে, আর পৃথিবী থেকে মহাকাশে। লেখচিত্র দিয়ে বেশ দেখানো যায় যে কবি- প্রবণতার মানবিক রেখাটি ক্রমে উপরের অঙ্কে উঠে গেছে, আর অন্যটি উপর থেকে ক্রমে নিচে নেমে এসেছে। নিদিষ্ট সূত্রের একমুখীনতায় নয়, এপাশ- ওপাশ করতে করতে অগ্রগতির বিশিষ্ট লীলাবিস্তারে তিনি সার্থক মহাকবি। এই আশ্চর্য সংগতির বশেই রাষ্ট্র ও সমাজের ছোট বড় পরিবর্তনের অভিঘাত তাঁর সৌরবর্ণালীতে গভীর রেখাপাত করেছে। এক মনোভাবের ভঙ্গিমা প্রারব্ধ হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নতর

মেজাজ কবিকে অন্যত্র নিবদ্ধ করেছে, সমাজ –আবর্তনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে। এমন একটি কবিতা হল 'কল্পনা' কাব্যের রোম্যাণ্টিক্ প্রাচীন-প্রয়াণের মধ্যেকার ঐ 'বর্ষশেষ'। এতে কবি পূর্বোক্ত সংগ্রামী উদ্দীপনার সঙ্গে মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণ গোষ্ঠীর জঘন্য বৈষয়িক স্বার্থপরতাকে তীব্র ঘৃণার চোখে দেখেছেন-

শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি-
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা-স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি।
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্নঅংশ-ভাগ
কহল সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

এ সময় অবশ্য কাব্য-কবিতায় মুখ্যভাবে চলেছে কবির স্বপ্নপ্রয়াণ, আর গদ্যে চলেছে সিডিশন বিল এবং কর্জনীয় ভাষাবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আবার একটু পরেই কবির প্রগতিমূলক কর্মীর ভূমিকা- শিলাইদহ পতিসরে গ্রাম সংগঠন। কিন্তু ঘটনাচক্রে কবিকে কেবল কল্পনায় নয়, চিন্তায় ও কর্মে পিছনের দিকেও ফিরতে হয়েছিল স্বল্প কিছু আগেই। ইংরেজি স্কুলের নিয়মতন্ত্রে বালক বালিকাদের শিক্ষা কবির মনঃপূত না হওয়ায় শান্তিনিকেতনে খুলে বসলেন আশ্রম-বিদ্যালয়। কল্পনা করে নিলেন প্রাচীন ভারতে তপোবনের কী আদর্শ ছিল। একই সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ নিয়ে নোতুন আলোচনা ও অনুবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে কাল্পনিক প্রাচীনতা নিয়ে ও তখনকার শিক্ষার আদর্শ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন, নৈবেদ্য সাজালেন প্রাচীন ভারতের সত্যলব্ধ জাতীয়তার বেদীতে। শান্তিনিকেতন ঐ জাতীয়তার ও কাল্পনিক কাব্যাদর্শের মহড়া চলতে লাগল। এইভাবে কাটল কয়েক বৎসর, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকে আবার মুখ ফেরাতে হল সামনের দিকে, রূঢ় বাস্তবে। রাষ্ট্র ও সমাজের অভিঘাতে কবির সমাচ্ছন্নতা কাটল। সূচনা হল বঙ্গবিচ্ছেদের। আন্দোলনে কবি যোগ দিলেন, লিখলেন উদ্দীপনামূলক গান, কিন্তু বিলাতী নুন ও কাপড়ের বর্জন-বয়কট ও অগ্নিদাহ যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিয়ে এল তখন কবি আন্দোলনের পথ ছেড়ে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত পল্লীসংগঠনের আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন, আর ১৯০৭-এ যেদিন জামালপুর মৈমনসিংহে অপ্রত্যাশিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হল তখন তার নিষ্ঠুর অভিঘাতে কবি নিঃশেষে জাগলেন। শিথিল হয়ে এল তাঁর প্রাচীনের কাব্যিক মোহ। ঐ সময়ে লেখা 'সুপ্রভাত' কবিতার মূলে রয়েছে সেই 'এবার ফিরাও মোরে'

কালের প্রত্যক্ষ মানুষ-সহানুভূতি। অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষরূপী পশুজীবনের যেন কাতর প্রার্থনা- ওগো শিক্ষিত বাবুরা, সর্বহারা আমাদের উদ্ধার করো। স্বামীজী-কথিত ভারতের 'চলমান শ্মশান' বর্ণনার অনুরূপ ছবি দেখিয়ে কবি ঐ নির্যাতিত হিন্দু-মুসলমানের উন্নয়নকল্পে সহায়তার জন্য কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন তখনকার শিক্ষিত ব্যক্তি ও জমিদারদের কাছে, রুদ্র-মহাকালকে সাক্ষী রেখে-

তোমার শ্মশান-কিঙ্করদল দীর্ঘ নিশায় ভুখারি,
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে
করেছে নৃত্য প্রাঙ্গণ পরে,
খোল খোল দ্বার, ওগো গৃহস্থ, থেকোনা থেকোনা লুকায়ে,
যার যাহা আছে আনো বহি আনো, সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে,
হৃদয়-পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহ রে।

কয়েক বৎসরের মানুষ দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতায় নিতান্ত শিথিল হয়ে এল তাঁর প্রাচীন আদর্শের ভাববন্ধন, সামনে সারি দিয়ে দাঁড়াল কঙ্কালসার অগণিত মানুষ, অর্ধ-অশন জীর্ণ-বসন নির্যাতিত হীনবর্ণ হিন্দু ও মুসলমান। এই যে এখন থেকে কবি সুনিশ্চিত ভাবে ফিরলেন, মুক্ত মানবতার মহাপূজারী বুদ্ধ-শ্রীচৈতন্যের সারিতে এসে দাঁড়ালেন, তার আর বিচ্ছেদ হল না তাঁর কবিজীবনের কোনো অধ্যায়েই। গীতাঞ্জলির মানুষের অপমান বর্ণনা থেকে, অচলায়তনের অস্পৃশ্য অন্ত্যজের অভ্যুত্থান পেরিয়ে বলাকার পুরাতনকে অস্বীকারের অধ্যায় সমাপ্ত হল বৈপ্লবিক ভাঙনের মন্ত্র উচ্চারণ করে –বাঁধ ভাঙে দাও, চূর্ণ করো বাধাবন্ধ, জীর্ণ পুরাতনকে নিঃশেষে হটাও, তার স্থান নিক যৌবনের উদ্দামতা, নবীনের অগ্রগতি। একই কবির কাব্যজীবনে কী গভীর পরিবর্তন ! রক্ষণশীলতার কাছাকাছি গিয়েও অন্তর্নিহিত সহজ শক্তি ও স্বচ্ছ বিবেকের জোরে তিনি বাস্তবে এলেন, বেছে নিলেন সংঘাতক্ষুব্ধ চলার জীবনকে। পুরানো সমাজ ও দৃষ্টির পুরানো আবরণ ছিন্ন করে বরণ করলেন চলিষ্ণুতার সত্য, সমাজ-পরিবর্তনের ধ্রুব ইঙ্গিতকে। ১৯০৭-৮ সালের মধ্যে পথ-হারানো মানুষকে ফিরে পেয়ে 'গোরা' উপন্যাসের দৃষ্টান্তে উগ্র জাতীয়তার মোহকে প্রতিহত করলেন এবং ১৯১২-তে বিলাত যাওয়ার আগে লেখা 'পথের সঞ্চয়' প্রবন্ধে হিন্দু রক্ষণশীলতার উপরে পশ্চিমের সাম্য ও বৈজ্ঞানিক বিবেককে তুলে ধরলেন।

‘গীতাঞ্জলি’ নাম থেকে সাধারণের ধাঁধা লেগেছিল এর গানগুলি ঈশ্বরের কাছে কবির বৈষ্ণব রীতির আত্মসমর্পন। কিন্তু তা যে নয়, ঈশ্বর বলে আভাসিত সত্তা যে নিসর্গেরই কল্পসৌন্দর্যের রূপকল্পনা তা বোধ হয় ইদানীং রবীন্দ্র- পাঠকদের আর বুঝতে অসুবিধা নেই। ঝড়ের রাতে যার অভিসার ঘটেছে, শরতের আলো-ছায়ায় যার সঞ্চরণ, শ্রাবণের বজ্রক্ষুব্ধ নিশীথে গোপনে যে আসছে, তা যে পুরানো ধারণার ঈশ্বর হতে পারে না এ বিষয়ে বোধ হয় আজকের পাঠক নিশ্চিন্ত। বিশেষে গীতাঞ্জলির মানবমুখী বাস্তবনির্ভর আদর্শের উদ্‌ভাস আমাদের কবিকে জাতিবর্ণের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদীরূপে চিহ্নিত করেছে। এর বহুপরিচিত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যা একই সঙ্গে আক্ষেপ ও অভিশাপের স্বাক্ষরবাহী তা হল ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ’ কবিতা। এ-কবিতাই আমাদের নিঃসন্দেহ করে যে, সমাজবাদী রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরের কাছে এমন কি মোহবিস্তারী নিসর্গের কাছেও আত্মসমর্পণ করেন নি। ‘অপমান’ কবিতার ‘সম্মুখে’ দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান’ এর সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে ষোল বছর আগেকার ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতার ‘ঐ যারা নতশির’ ইত্যাদি, ‘সুপ্রভাত’ কবিতার ‘অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে’ বলাকার ‘পাড়ি’ কবিতায় ‘সে থাকে এক পথের পাশে অদিনে যার তরে বাহির হল নেয়ে’ আর পরিশেষে ‘ঐকতান’ কবিতার সকরুণ আবেদনের স্বপ্ন-

মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী-
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

গীতাঞ্জলির মানবিকতার পর কবিচিত্তে যাত্রী-মনোভাব এবং সঞ্চয় না রেখে অজানার পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃপ্ত দূরন্ত আশায় উদ্দীপনা। শীঘ্রমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ আসছে, সংঘাত সংগ্রাম এমনকি মৃত্যুবরণ করার মধ্যেই প্রাণের সত্যের পরীক্ষা হবে এই নোতুন ভাবুকতায় কবি উদ্দাম অধীর। আমাদের জড়জীবন বহন ও স্থিতিশীলতার আগ্রহ প্রবলভাবে আহত হল নোতুন কল্পনার আঘাতে। এখন থেকে অজানা পরিবর্তনের অভিমুখে নবযৌবনের জয়যাত্রা পরিস্‌ফুট ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগল। এবার সত্যদর্শীর সুনিশ্চিত দর্শন নিয়ে কবি দেখলেন মানুষের বিস্ময়কর জয়যাত্রা, আদিম জীবন থেকে আজ পর্যন্ত, অভিব্যক্তির সূত্র ধরে। দেখলেন মানুষকে শৃঙ্খল থেকে অপমান থেকে মুক্ত করার বার্তা নিয়ে আসছেন মানুষেরই অগ্রগতির মূর্ত স্বরূপ- মহামানব সত্তা, যিনি লাঞ্ছিত মানুষের জন্যই দুর্যোগের মধ্য দিয়ে এসেছেন, যিনি- ‘অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী’। বলাকায় এসে এই যে পরিবর্তন ও সংগ্রামের সত্যে অবিচল হলেন কবি,

পুরাতনের আবর্জনা নিঃশেষে পরিষ্কার করার মনোভাব জানালেন, তার রেশ চলল কবিজীবনের শেষ পর্যন্ত।

গীতাঞ্জলি-পর্ব সৃষ্টির স্থির সত্যে সুস্থির কবিকে মানুষ-দর্শনে অনুপ্রেরিত করেছে। তাই শ্রেণীস্বার্থপরায়ণ সমাজের মানুষ-অবমাননার আঘাত কবিকে করেছে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রবল প্রতিবাদী। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় কবির যে বেদনা-বিক্ষোভ তাকে আরও পরিস্ফুট করে তোলার কাজে তাঁকে লিখতে হল 'অচলায়তন'- নাট্যাকারে। এতে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের সংঘর্ষে হীনীকৃত মানুষের বিজয় ঘোষণা করে, আর, পুনরায় অচলায়তন গড়ে উঠলে এইভাবেই তাকে ভাঙতে হবে এই আশ্বাস দিয়েই তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছেন। গীতাঞ্জলি- পর্যায়কে যাঁরা কবির ঈশ্বর-অনুভূতির পরিচয় হিসাবে দেখেছেন তাঁরা ভুল দেখেছেন। ঐ ঈশ্বর প্রচলিত ধারণার ঈশ্বর নয় আর মানুষও নির্জীব স্তুতিবাদী নয়, বিলাপ করতে করতে শেষে সংগ্রামকেই সমাধান বলে বরণ করে নিয়েছে। আচার-প্রথার বন্ধন, ভুয়া শাস্ত্র-বাহিত জড়ত্ব ও স্বার্থ- কলঙ্কিত বৈষয়িক জীবনের বন্ধন-ছেদই হল 'ডাকঘরে'র মর্মকথা। 'রাজা' নাটকের না-দেখতে-পাওয়া রাজাও পথের ধূলায় মুক্তির জন্য স্বার্থে বন্দী মানুষকে আহ্বান করেছেন। কবি নিজের বাউল-জীবনেও যাত্রামুখর পথের মধ্যেই মুক্তির স্বাদ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই সব অনুভবের একত্রিত ও প্রচণ্ড যে মূর্তি তারই নাম বলাকা, মহাযুদ্ধের আগুনে কামান- গর্জনের মধ্যে যার স্বরূপ কবির কাছে স্পষ্টাক্ষরে উদ্ভাসিত হয়েছিল। এতে কবি উপলব্ধি করেছিলেন যে সংগ্রামী আত্মদানের মধ্যে দিয়েই নূতন জীবন আসবে, অন্যথায় নয়, কোনোমতেই নয়, আর এরই ফলে সমাজের পুরোনো জড়তা বিধ্বস্ত হবে। এই সময়ে কবি শান্তিনিকেতনের উপাসনাগৃহে যে কটি ভাষণ দেন (অমৃতসা পুত্রাঃ, মাভৈঃ, মা মা হিংসীঃ প্র) তাতে প্রথম মহাযুদ্ধকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে এই বলে যে এই যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বদেশবাসীদের উদ্দীপিত করা হয়েছে শ্রেণীস্বার্থবাহী বর্ণসম্প্রদায়-ভেদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে। দেখা যায়, শান্তিনিকেতন- ভাষণমালায় কবি কেবল ব্রহ্মতত্ত্বই করেন নি, সমাজতত্ত্বেও করেছেন, আর আধুনিক জীবনের উপযোগী মুক্ত মানবতার পথে দুঃখের মধ্য দিয়ে অগ্রবর্তী হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন।

বলাকা-পূর্বে যে রূপান্তর-সত্যে ও সংগ্রাম-সত্যে কবি দৃঢ়ভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন তার আর একটা বড় স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে ফাল্গুনী, তাসের দেশ ও অন্য বহু গীতিনাট্যে। কবি দেখিয়েছেন পুরানোকে অস্বীকার করে নূতনের জয়যাত্রা চলেছে ঋতুপর্যায়ের আবর্তনে, আর সেই সঙ্গে মানবসমাজের বিবর্তনেও। স্বার্থলোভী আমরা পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকি সাময়িক সুবিধাবাদের নীতিতে। অথচ সৃষ্টির নিয়মে রয়েছে নূতনের আহ্বান, ভাঙার পর গড়া, আবার

ভাঙা, আবার গড়া এর অফুরন্ত এক প্রবাহ। একে আমাদের বরণ করতেই হবে, পুরোনো সংস্কার ও পুরানো প্রথার জড়ত্বকে চলমান মানবসমাজ কখনোই ক্ষমা করবে না, এর অপঘাত-মৃত্যু অনিবার্য। এই হল গোঁড়া অন্ধদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি কবির সাবধান-বাণী। এর একটা তাত্ত্বিক সত্যের দিক কবি উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন 'বসন্ত-নবীনের' গীতিগুচ্ছের মধ্য দিয়ে, আর পৃথিবীর কথায় সঙ্গে মহাকাশের তত্ত্বকে সমন্বিত করে।

পরিবর্তনচক্র-বর্তী বৈজ্ঞানিক মহাকাশ-দর্শন কবির অহরহ ধ্বংস-সৃষ্টির ধারণাকে আরও সুস্থির , আরও প্রগল্‌ভ করেছে। আধুনিক পারমাণবিক বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে, পরমাণুভিত্তিক সূর্যনক্ষত্রের ভৌত রূপান্তর দৃষ্টে তাঁর নিজের অনুভূত নূতনের জয়যাত্রার বাণীকেই আরও নিশ্চিতভাবে সত্য করে প্রমাণ করলেন কবি। গদ্যে পদ্যে ও নৃত্যগীতের আকারে তা শতধিকবার আমাদের গোচরে নিয়ে এলেন আমাদের সংকীর্ণ বিমূঢ়তার সংশোধন করতে। পরমাণু- বিজ্ঞান এবং তদনুসারে নীহারিকা-সূর্য-নক্ষত্রের আবির্ভাব তিরোভাবের নব পরিচয় পেয়ে গীতাঞ্জলি রচনার পর্যয়েই কবি আমাদের একবার উদ্‌বুদ্ধ করার প্রয়াস করেছিলেন উদাত্ত আহ্বানে-

পারবি না কি যোগ দিতে এই
ছন্দে রে।
এই খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।.....
পাতিয়া কান শুনিস্‌ না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন তারা চন্দ্রে রে।।

ফাল্‌গুনী –বলাকা পর্যায়ে নবীনতায় সুনিশ্চিত আস্থা কবিকে বারংবার মহাকাশ ও পৃথিবীর অবিরাম চলমান গতিচ্ছন্দের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে একত্রিত দেখার সত্যে উপনীত করেছে। কবি কল্পনা করেছেন নটরাজের তাণ্ডব, যার এক পদক্ষেপে ধ্বংস ও অন্য পদক্ষেপে সৃষ্টির বর্ণবৈচিত্র্য প্রকাশ পাচ্ছে। কবির ধারণায় এই পরিবর্তন-সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করাতেই মুক্তি। মুক্তি মন্ত্রে ধ্যানে নয়, পূজার মন্দিরে নয়, অন্যের থেকে নিজেকে পৃথক করায় নয়, বৈজ্ঞানিক সত্যে আস্থাবান্‌ হয়েই। অতএব কবি গাইলেন-

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।

সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ
নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।.....
নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র-ভানু।

কবির এই জরা-জড়ত্ব-বিধ্বংসী নিত্যনবীনের আদর্শ বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার স্পর্শে সত্যতর হয়ে ফুটে উঠল পর পর লেখা অজস্র কাব্যে নাট্যে। কল্পনা ও বাস্তবের এই আশ্চর্য মিলনের রহস্যকথাই কবির প্রজ্ঞানময় উপলব্ধি শেষ কথা। এর পর আছে ঐ সত্য-সমৃদ্ধ মন নিয়ে মানুষকে পর্যবেক্ষণ, কর্মী ও মেহনতী মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির উৎসারের পর্যায়। কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখনও বিজ্ঞান যা সম্যক্ পরিস্ফুট করতে পারে নি, অথচ ভাবীকালে পারবে এমন সম্ভাবনা রয়েছে, আমাদের মহাকবি তা পূর্বাহ্নেই অনুভব করে, জ্বলন্ত-গ্যাস-বলয়িত সূর্যরশ্মিকণার বিচ্ছুরণের স্পর্শেই তাঁর তথা আমাদের চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি নিয়ন্ত্রিয় হচ্ছে- এমন বিস্ময়কর কথা শোনালেন পূরবী কাব্যের 'সাবিত্রী' ও 'আহ্বান' কবিতায়-

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমারে দিয়েছে যে ভরি
কেই বা সে জানে?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে?

আবার, পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্য ও সৌন্দর্য প্রকাশের মূলে যে ঐ সূর্যরশ্মিই রয়েছে তাও পরিস্ফুট ভাবে জানালেন-

কোন্ জ্যোতিময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।

তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে,
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া ওঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

কবি এখন মানসিকভাবে মহাকাশ-যাত্রী আর সেই সঙ্গে বিকিরিত রশ্মি-সংযোগ ও মহাকর্ষের বন্ধনে বিজড়িত পার্থিব বর্ণগন্ধময় মৃত্তিকার সঙ্গেও। পথিক কবি কেবল পরিবর্তন-সত্যের তত্ত্ববাহীই নন, নিজ মানসিক জীবনে বাস্তবভাবে তার অনুগামীও। তাই নিসর্গ ও গৃহ-পরিবেশ থেকে "ধূসর প্রসর রাজপথে, জনতার মাঝখানে" যেমন অনায়াসেই চালিত হয়েছেন, তেমনি কল্পনার দৃষ্টিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত পর্যবেক্ষণ করে ও তপোবনের আরণ্য জীবনের মহিমা কীর্তন করে সাময়িক তৃপ্ত হয়ে দ্রুতপদ – সঞ্চারে ফিরেছেন ঝটিকাক্ষুব্ধ সংগ্রামী জীবনের দিকে, স্থির হয়েছেন পৃথিবী ও মহাকাশের সৃষ্টি ও বিলয়চক্রের অতিনিশ্চিত ঘূর্ণাবর্তে এবং মানুষকে ডেকেছেন স্বার্থে আবিল বিষয়ের বন্ধন ত্যাগ করে নিত্যনবীন বসন্তের দিকে , যে বসন্ত ভাঙনের মধ্য দিয়ে আসে নির্দয় নবযৌবনের দূতরূপে-

.....দস্যুর মত ভেঙে চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।

এর পরের অধ্যায়ে ঐকান্তিক প্রীতি ও সহানুভূতির যোগে চিরদুঃখী অথচ সদা-নীরব মেহনতী মানুষের সঙ্গে আত্মিকতার আগ্রহ। আর, তাঁর বাস্তব জীবনে ঐ কর্মী মানুষের আত্মদানের সঙ্গে তাঁর সখ্যবন্ধন ঘটেনি বলে বারংবার আক্ষেপ-

যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার
মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে,
সেই রুদ্রমানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

বিখ্যাত 'ঐকতান' কবিতাতেও কবি তাঁর এই অপূর্ণতার কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন-

সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।.....
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

আর সেই সঙ্গে কৃষাণের এবং মেহনতী মানুষের শরিক হয়ে তাদের জীবনরহস্য যিনি চিত্রিত করবেন এমন কবিকে অভিনন্দিত করার জন্যও মহাকবি প্রতীক্ষা করেছেন।

এই নিরবচ্ছিন্ন সাধারণ-মানুষ-প্রীতি একালে কবিকে যুদ্ধবিরোধীও করে তুলেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ধনতন্ত্র বৈশ্যতন্ত্রের সর্বনাশ হোক এই কামনা করে কবি মহাযুদ্ধকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন- " স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়, তবে মুক্তি"। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্বিচারে নারী-শিশু-হত্যাকারী ফ্যাসিস্টদের বিনাশের জন্য তিনি যুবশক্তিকে আহ্বান জানালেন-

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে-
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

কিন্তু শুধু কবিতা নয়, আবেদন আরও প্রত্যক্ষ যার এমন নাট্যসৃষ্টির মধ্য দিয়েও মানুষের শোষণমুক্তির কথা চিত্রিত করেছেন একালের লেখা প্রায় সব কটি নাটকেই। 'মুক্তধারা' নাটকের মাধ্যমে যন্ত্রসহায় রাষ্ট্রের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত সাধারণ প্রজাদের জয়ধ্বনি পূর্বেই প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি ধনতন্ত্রিকের কারখানার গহ্বরে বন্দী ও মনুষ্যত্ব-হারা মানুষকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার মনুষ্যত্ব 'রক্তকরবী'র রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী "কালের যাত্রা'য় প্রমাণ করলেন যে হীনবর্ণের শ্রমজীবী মানুষ না টান দিলে জাতীয় জগন্নাথের রথ অচল হয়েই থাকবে।

কবির সাধারণ মানুষপ্রীতির আর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত সাঁওতাল শ্রমজীবীনীদের উপর প্রত্যক্ষ মমত্ব। সাঁওতাল নারীকে দেখলেন তার নারীত্বের স্বমহিমায়। দেখালেন, এর যে দু'খানি হাতের স্নেহসেবা পাবার জন্য সন্তান ও স্বামী সারাদিন

প্রতীক্ষা করে থাকে, সেদু'টিকে মালিকশ্রেণীর বিত্তবান আমি মাটি বওয়ার কাজে লাগিয়েছি, পয়সার সিঁধকাঠি দিয়ে চুরি করে নিচ্ছি তার শ্রমশক্তি, আর সেই সঙ্গে তাকে বঞ্চিত করছি প্রাণের স্বর্গ থেকে। কী অপরিসীম করুণা, কী বাস্তব সমবেদনা নির্যাতিত শোষিত মানুষের জন্য! সৃষ্টির যা শ্রেষ্ঠতম অবদান, যা শেষ অর্থ, সেই মানুষজীবনকে বারংবার প্রত্যক্ষগোচর করিয়েই যেন কবি তাঁর মহান দায়ীত্ব পালন করেছেন। পরিণাম পর্যন্ত নিজ কাব্যকবিতার মানবিক উপসংহার রচনা করে কবিদের শেষ লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা প্রতিপন্ন করেছেন-

নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি.....

রবীন্দ্রনাথ কি ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য কাতর হয়েছিলেন ? যে ব্রহ্মের এত মহিমা বেদে উপনিষদে? এর উত্তর, না। সৃষ্টির প্রত্যক্ষ নিসর্গ এবং মানুষব্রহ্মাই তাঁর উপাস্য হয়েছে। তাই তাঁর পরিণত বক্তব্য হল – বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছে মানুষ। পর্যায় থেকে পর্যায়ের লীলা পার হয়ে, একই সময়ে কল্পসৌন্দর্য ও মানুষকে দেখতে দেখতে পরিশেষে তিনি মানুষের অতি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। এর উপরের কাল্পনিক তত্ত্ববস্তু নিয়ে তত্ত্ববাদীরা বহু জল্পনা করেছেন, প্রত্যক্ষ বর্জন করে ভেবেছেন তুরীয় লোকের কথা। কিন্তু কল্পিত ব্রহ্মকে না পেরেছেন ছুঁতে, না পেরেছেন ধরতে- ব্রহ্ম তাঁদের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয় নি। অতলান্ত মানুষ- রহস্যেই সৃষ্টির শেষ সীমা, তার বাইরে যদি কিছু থাকে তা নিয়ে না চলে আলোচনা, না নির্মিত হতে পারে কাব্য। আমাদের কবিও তাঁর অন্তরে প্রশ্ন তুলেছেন, যেমন প্রথম জীবনে , রোম্যাণ্টিক কল্পনার মধ্যে, তেমনি শেষ জীবনে মানুষের দ্বারে এসে। জবাব পান নি এবং না পেয়ে সামগ্রিক মানুষের মধ্যেই সমাধান নির্ণয় করেছেন, আমাদের আশ্বাসে জানিয়েছেন-ঐ মহামানব আসে।

যে পথে অনন্তলোক.....

বুর্জোয়া শ্রেণী-চরিত্রের জটিল মানসিকতা থেকে পরিশীলিত বাক্ - ভঙ্গিমার বিস্তার ঘটতে পারে, সু-কাব্যকবিতার আবির্ভাব সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ জন্ম ও পরিবেশে পুরানো অভিজাতিক হলেও অবস্থা-বিপাকে ও নিজ মানসিক শক্তিতে তা লঙঘন করেছিলেন। অবশ্য তাঁর নিজ-পরিবারেই এমন উদার মানবিক হাওয়া বইত যা কাউকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও উন্নাসিক করে তুলতে পারে নি। দুর্লভ অপক্ষপাত দৃষ্টিকোণের অধিকারও কবির মজ্জাগত ছিল।

কিছু বেশি একশ' বছর আগেকার কথা বলছি। নৈসর্গিক রম্যতা ও কোলকাতা-কেন্দ্রিক সীমিত মানুষ-পরিবেশ নিয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন এক উদীয়মান তরুণ কবি। তাঁর সামনে ছিল বিহারী-বঙ্কিমের প্রকৃতি-চিত্র ও প্রেমার্তি, পাশে ছিল ইংরাজির রোম্যান্টিক স্বপ্নাবেশ, আর পিছনে ছিল বৈষ্ণবীয় অপার বিরহ-পারাবার ও প্রাচীনতর কবিকুলের অলংকার-শিঞ্জিত রম্য পদক্ষেপের পটভূমি। এরই সঙ্গে ছিল জোড়াসাঁকোয় নিজ পরিবারে গড়ে ওঠা শুদ্ধ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল। অজানার বেদনায় বিদ্ধ কবির সেদিন মনে হয়েছিল- এইভাবেই কাটবে দিন, ঐ শূন্য- নীলিমায় কনকবর্ণ পাখা মেলে উধাও হাওয়ার মধ্যে, হারানো কল্প – প্রণয়িনীকে শিপ্রানদীপারে অন্বেষণ করতে করতে। কবি জানতেন না, তাঁর জন্যে বিপরীত বিধিলিপি অপেক্ষা করে আছে, সাময়িকভাবে অতিপ্রিয় ঐ শূন্যবিহারের কুহেলী থেকে তাঁকে মুক্ত করে – প্রখর সূর্যালোকের রূঢ় বাস্তবে নিক্ষেপ করার জন্য। পূর্বসংস্কারবিরোধী এরকম কোনো অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সৌভাগ্য প্রাক্তন সাম্প্রতিক কোনো কবির ক্ষেত্রেই ঘটেনি। বলা বাহুল্য , মধ্য-উত্তর বঙ্গে জমিদারি দেখার কাজে এসে কবির নবজন্ম ঘটেছিল, কৃত্রিম আভিজাত্যের আবরণ প্রায় স্থলিত হয়ে পড়েছিল।

যা চলছে, বাঁধা বরাদ্দ যা আছে, তাকেই মেনে চলার প্রবৃত্তি নিয়ে এই কবি জন্মান নি। শিলাইদহে আসার পর জমিদারি দেখার সঙ্গে আর যা দেখলেন তাতে ক্রমে ক্রমে তাঁর পূর্বতন স্বপ্নদর্শন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, নোতুন করে গড়ে উঠল একান্ত বাস্তব মানুষকে দেখার দর্শন। বলা চলে খাঁটি জীবন-দর্শন, বাঙলা কাব্যের নিতান্ত গতানুগতিক পরিস্থিতিতে যা বৈপ্লবিক। কবি দেখলেন অর্ধাশিত প্রায়-নগ্ন ঘামঝরা কঙ্কলগুলি অক্লান্ত পরিশ্রমে ফসল উৎপাদন করে চলেছে। জোতদার-মহাজন সম্প্রদায়ের কাছে ঋণের বোঝা নিয়ে এরা আপাদমস্তক বিক্রীত, এদের নাই গান, নাই আনন্দ, আছে শুধু দিনযাপনের প্রতিনিয়ত দুর্ভাবনা,

আর নায়েব-গোমস্তার লাঞ্ছনা। কবির আত্মভাবনা ও শূন্যকল্পনা ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল যে-মুহূর্তে তিনি তাদের ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে এসে দাঁড়ালেন, প্রত্যক্ষে দেখলেন অভূক্ত নিরানন্দ শিশুকুল ও দীনা মাতৃমূর্তি। ফিরে এসেই নিশ্চিন্তে সুখভোগী তাঁরই স্বশ্রেণীর মানুষের বিবেক উদ্বোধিত করার জন্য হাঁক দিলেন- ওরে, তুই ওঠ আজি। আগুন লেগেছে কোথা ! কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না, কারণ, এ পথে যে তিল তিল করে কৌশলে গড়েতোলা এতদিনের পরিপুষ্ট জীবনের ভয়ংকর অপমৃত্যু। একই সময়ে পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে একই আহ্বান জানালেন জাতীয় জাগরণের অপর এক বিস্ময়-এক নবীন সন্ন্যাসী। কিন্তু কোথায় নিশ্চিন্ত লালনে লালিতদের সুখস্বর্গ ত্যাগ করে আসার আশ্বাস! বিদেশী মানুষ বরং ছুটে এল, দীন স্বদেশবাসীরা রইল পিতৃপিতামহের পুরানো সংস্কার এবং শ্রেণীশোষণমূলক আরামের জীবন কেন্দ্র করে। পরিশেষে মানুষদ্রষ্ট্য অস্থির মহাকবি একাকী পথে ও কাজে নেমে পড়লেন কাঁটার অভ্যর্থনা ও গুপ্ত সমালোচনা তুচ্ছ করে। তাঁর নিজ অন্তরে যে বিবেকী আত্মা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার কাছে নূতন-দেখা এই অদ্ভুত মানুষগুলির সঙ্গ-সাহচর্যের কাতরতা জানিয়ে আবেদন করলেন-

যে পথে অনন্ত লোক চালিয়াছে ভীষণ নীরবে,
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখির বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তের।

যুগ যুগ ধরে ক্ষুধা নিয়ে ঘর্মধারা বহন করে খেটে চলেছে যে ভাষাহীন নির্বাক জীবগুলি তাদের অব্যক্ত আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না একদা আত্মলীন কবি এবং এই পরিবর্তিত মহাকবি। তাঁর ভাবনার মধ্যে দৃঢ়ভাবে সংসক্ত কোটি কোটি সাধারণ ও মেহনতী মানুষের কথা তাঁর জীবন-সায়াহ্নেও সমানভাবে পুনঃপুন উচ্চারিত হতে দেখা যায়-

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে

ভিক্টোরীয় কালের সমাপ্তির দিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন আরও জেঁকে বসল, ছোট-বড় ইংরেজ প্রশাসকের কাছে নেটিভ্ আখ্যায় বিশেষিত ভারতবাসীর লাঞ্ছনার সীমা রইল না। এই পরিস্থিতিতে কেবল কবিতায় নিমগ্ন না থেকে কবি হাতে ধরলেন গদ্যের শক্ত লাঠি। একের পর এক লিখে চললেন – সাঁওতাল বিদ্রোহের যথাযথ কারণ ও ইংরেজের আতঙ্ক, অপমানের প্রতিকার, সুবিচারের অধিকার, রাজা ও প্রজা, অন্যায়ের প্রতিরোধ, ইংরেজ ও ভারতবাসী। আর একদিকে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন মোসাহেবী জমিদার-চরিত্র ও কৃষক-প্রজা-নিগ্রহ, আর জাতিভেদকে জিইয়ে রাখার চারিত্রিক হীনতা। স্বাধীনচেতা কবি কংগ্রেসের মডারেট ও আলট্রা কোনো দলেই প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আপোষহীন নীরব সংগ্রামেরই ঘোষণা দিয়ে বসলেন মাটি- সংলগ্ন মানুষের অধিকার দাবী করে। কবি দেখলেন, ইংরেজ প্রশাসনের সুবিধা করে দিচ্ছি আমরাই, তাদের শিক্ষানীতি বরণ করে। কিছু কর্মচারী ও প্রয়োজনমাফিক কেরানির সৃষ্টি হচ্ছে দেশে, কিন্তু মনুষ্যত্বের সঙ্গে সমাজ-উন্নয়নের বিকাশ ঘটছে না। আর সব থেকে বড় কলঙ্ক হল এ শিক্ষানীতি গণতান্ত্রিক নয়। একই সময়ে একই কথা স্বামীজীর মুখেও ব্যক্ত হতে থাকল। মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থায় দাবী বারংবার জানাতে লাগলেন কবি, মনীষীদের চিত্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়কে এ বিষয়ে উদ্‌বোধিত করতে চাইলেন। পরিশেষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে নিজেই একটা প্রয়াস নিলেন এই ইং শতাব্দীর প্রথম বৎসরেই শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তখনকার স্বদেশীয় কোনো আদর্শ সামনে না পেয়ে ছুটলেন প্রাচীন কাব্যে চিত্রিত তপোবনের অভিমুখে, অবশ্য সাময়িকভাবে, কারণ যখন তিনি বুঝলেন যে তখনকার মুষ্টিমেয়ের শিক্ষাপ্রণালী সামগ্রিকভাবে এখন চলবে না, ওটা একটি ইউটোপিয়ায় দাঁড়াচ্ছে, তখন ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পুরানো রীতিনীতির বালাই, সূক্ষ্ম ভাবটুকু মাত্র রাখলেন-সে হল স্বাধীন নিসর্গ-পরিবেশে মুক্তমনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের তাৎপর্য। পরিশেষে যা দাঁড়াল তা আধুনিক শিক্ষার অমানবিক যান্ত্রিকতাও নয়, পুরাতনের বর্ণাশ্রমী বিধানও নয়; সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়ে স্বতঃ-বিকাশোন্মুখ চিত্তের উদ্দীপন, আর সেই সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মিলন ঘটানো। আবার গণশিক্ষার অভিনব ধারা চিহ্নিত করে খুললেন সমাজ-শিক্ষা-শিবির, হাতে-কলমে কৃষি-শিক্ষা, শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা। কবি চলে গেছেন, এসব উদ্‌যোগও সেই সঙ্গে প্রায় স্তব্ধ অথবা ভিন্ন রূপ নিয়েছে, প্রশাসনিক স্বার্থ গুরু-শিক্ষার্থী সবই যেন এক যাদুঘরের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত। হাতে-গলায় কাঁকন-হাঁসুলী আর মাথায়-ফুল ক্যামেলিয়াদেরও আর তেমন স্বগৃহবোধে শান্তিনিকেতনে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে দেখা যায় না। কাব্যস্বপ্ন ও বাস্তবের সমন্বয় ও তার মধ্যে সর্বস্তরের মানুষের বিমিশ্রণ-তত্ত্ব দিল্লীর ব্যবসায়িক বন্ধুদের মাথায় ঢুকবে এতটা তো আর প্রত্যাশা করা যায় না।

একটি সুন্দর ও সুমহৎ আদর্শের তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কি অবশেষে মৃত্যু? কিন্তু নাঃ-

মরে না, মরে না তাহা, সত্য যাহা, শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে।

তাই কবি আজও জীবিত, বরং ক্রমাগত প্রতিবাদী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগের থেকেও আরও জীবন্ত। জীবন্ত-নীরবে অবহেলায় মৃত্যু-বরণ-করা মানুষগুলির শুষ্ক ভগ্ন বুকে।

এই মানুষের টানেই কবিরবি স্বপ্নরাজ্য থেকে ফিরেছিলেন, ফিরেছিলেন হেমন্তের স্বর্ণশীর্ষ মাঠে, ফিরেছিলেন তাদের পাড়ার প্রাঙ্গণে, যাদের বীজ বোনা ও ধানকাটার অধিকার মাত্র আছে, সারা দেশের অন্নের সংস্থান করে যারা কণিকাপ্রত্যাশী হয়ে দিন কাটায়। তিরিশ বছর বয়সে গ্রামাঞ্চলে এসে গ্রামেঘোরা অভ্যাসে পাকা-হয়ে কবি এবার লাগলেন ভূমি-সংলগ্ন সর্বহারা মানুষের শিক্ষা ও আর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে। অভিজাত মানুষ ও অর্থবান জমিদারদের কাছে আবেদন জানাতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে সংস্কারে বিমূঢ় সাধারণকে উদ্‌বোধিত করতে চাইলেন ভাষণে ও প্রবন্ধে। হিন্দু-মুসলমানকে পরাস্পর পৃথক রেখেছে যে বিকৃত শাস্ত্রবুদ্ধি ও আচারের গোঁড়ামি, তার গোড়ায় আঘাত হানতে লাগলেন বারংবার। কেউ বা ছুটে এল তাঁর পাশে, তাঁর উদ্‌যোগে সহায়তা করতে, অনেকেই দুঃস্বপ্নে শিহরিত হতে থাকল। এই রূঢ় বাস্তব মানবিকতার আঘাতে চূর্ণ হল তাঁর প্রাচীনধর্মী নস্ট্যালজিয়া, যেমন আগেই শিথিলিত হয়েছিল তাঁর 'উর্বশী বিজয়িনীর' চন্দ্রকান্তিময় মণিহর্মা। কবি এখন সব্যসাচী, এখন যোদ্ধা। তাঁর এক হাতে চক-ব্ল্যাকবোর্ড, অন্য হাতে কোদাল-লাঙল। স্কুল-পত্তন, পথ-নির্মাণ, শস্যভাণ্ডার, পঞ্চায়েতী বিচার, চিকিৎসালয়, সমবায়, চাষীদের ছ'মাসের অবসর সময়কে উৎপাদনমুখী করে তোলার প্রয়াস পর্যন্ত বাদ গেল না।

এরই মধ্যে এসে পড়ল প্রথম মহাযুদ্ধ। ভারতের প্রশাসকদের সযত্নে গড়ে তোলা উপনিবেশগুলি প্রায় যায় যায়। ইয়োরোপে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, কামানের গর্জন, আর এখানকার কেন্দ্রে ও প্রদেশে তার দুরুদুরু প্রতিধ্বনি। আতঙ্কিত বিহ্বল পৃথিবীতে কিন্তু কবি উঠলেন জেগে। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে এ যুদ্ধ বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের ব্যাপার নয়, সাম্রাজ্যবাদী লালসার। দেখলেন সাম্রাজ্যবাদ তার প্রাপ্য সর্বনাশের মুখে। সুতরাং মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত করলেন লড়াইকে, আর সেই সঙ্গে উপাসনা-গৃহে বসে বোঝাতে লাগলেন ভারতেও একই সঙ্গে লড়াইয়ের প্রয়োজীয়তার দিক। বললেন , আমাদের লড়াই কিন্তু আমাদেরই সঙ্গে, কুসংস্কারের ভূতের সঙ্গে, জাতপাঁত- সম্প্রদায়- ভেদের, শাস্ত্র ও আচার দিয়ে পাকা করে গড়ে তোলা কারাগারের বিরুদ্ধে, এইভাবে শোষণের দুর্গকে ভাঙবার সংকল্প

নিয়ে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান জানালেন তরুণদের- লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে, গান আছে যার ওঠ্ না গেয়ে, প্রাণ আছে যার আয় না ধেয়ে, আয় না রে নিঃশঙ্ক। এখন থেকে নিছক সৌন্দর্যস্বপ্নের বিলাসী কবিজীবন স্খলিত হয়ে ছিন্ন হয়ে পড়ল। রেশ যদি কিছু থেকেও থাকে, গ্রাম ও মানুষ, অশিক্ষার তমিস্র্য ও ক্ষুধার অগ্নিদাহ তা নিঃশেষ করলে। এখন থেকে কেবল সংগ্রামের ডাক-এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা। এখন থেকে যাবতীয় কাব্য-নাটকে লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষের অবশ্যম্ভাবী জয়ের ঘোষণা।

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দাম আবেগ দেখা দিয়েছিল মহাযুদ্ধের বেশ কিছু আগেই। কবি হিন্দু-মুসলিম, কৃষক ও খেতমজুরকে সে আন্দোলনের কেন্দ্রীভূত দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হয় নি। এদের নিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছিল একাকী। মহাযুদ্ধান্তে নোতুন স্বদেশী জোয়ারে এল অসহযোগ, এল চরকা। কবি মেলাতে পারলেন না। বললেন, জাতিবর্ণবিভেদই মানুষের প্রধান শত্রু, গৃহশত্রু, আর মাটি ও মাটি-সংলগ্ন মানুষের উদ্বোধনই স্বাদেশিক প্রয়াসের প্রথম পাদপীঠ। হিন্দু-মুসলমান না মিললে ভারতের স্বাধীনতা হবে ফুটো কলসিতে জল ভরা, আর জাতপাঁতের নোংরামির উচ্ছেদ না হলে গরীবেরা থাকবে চির-শৃঙ্খলিত –সে স্বাধীনতার রঙীন ফানুস দেখতে যতই চটকদার হোক, তা আপনাকে আপনি আঘাত করতে থাকবে। কারণ, তা হবে মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতা। ফলে, পরিশেষে যে অন্তর্ঘাত আসবে তা সামলানোর শক্তি বিভক্ত-মানসিকতার দেশে থাকবে না। সুতরাং কবি আরও জোরের সঙ্গে একক প্রয়াসেই অবহেলিতের মুক্তি-সাধনায় নিযুক্ত রইলেন। বান্ধবদের উপদেশ উপেক্ষা করে সোভিয়েট পরিদর্শনে গিয়ে তিনি নিজ প্ল্যানিং-এরই সুবৃহৎ সমর্থন লক্ষ্য করে স্বদেশ সম্পর্কে দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে লাগলেন- হায়, কী হতে পারত!

এল ফ্যাসিস্ট যুদ্ধ। দুই মহাযুদ্ধের সাক্ষী কবি হলেন, কিন্তু এবারকার – শিশুঘাটী বীভৎসতায় ফ্যাসিস্ট প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন কবি। কবিতায় প্রবন্ধে চিঠিপত্রে যুদ্ধবাজদের তীব্র কটূক্তিসহ ধিক্কার দিতে থাকলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করার মানবিক সত্যে চির আস্থাবান কবি এই কাপুরুষী সামাগ্রিক যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য বিবেকী মানুষ ও তরুণদের আহ্বান জানালেন।

মহাকবির সমাজ-ব্যক্তিত্ব আমাদের স্বদেশিক পুনর্গঠনের নির্দেশক স্তম্ভ হয়ে আছে। তাঁর সীমিত সমাজতান্ত্রিকতারও সামিল এখনও হওয়া যায় নি। আবার শত্রু আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। রয়েছে বর্ণ- অভিমান ও শোষণমূলক সুবিধাভোগের লালসায়- পূর্বে শাস্ত্রনীতির ও বর্তমানে রাজনীতির ছদ্মবেশে। ক্ষমতা করায়ত্ত করে, কবি আগে যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই করছে। দ্রষ্টা কবি বারংবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন- সুবিধাবাদ, মৌলবাদ, অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং প্রচ্ছন্ন শোষণ-

প্রবৃত্তি যতদিন থাকবে ততদিন ভারতের মুক্তি নেই। মহাকবির দৃষ্টি যে কত স্বচ্ছ , কত প্রগতিমুখী তার অবান্তর পরিচয় রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একই সূত্রে তাঁরও পরমাণু-ভিত্তিক বিশ্ব দর্শন। আজও আধুনিকতম কবি তিনি। কল্পনা এবং বিজ্ঞান, মাটি-মানুষ এবং স্বদেশ-উন্নয়ন তাঁর সামগ্রিক জীবন-দর্শনে এক হয়ে মিলে গেছে। অন্তরঙ্গভাবে নৈষ্ঠিক সত্যদর্শী তিনি। এজন্য প্রতি বৎসর তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করে আমাদের অনুপ্রেরিত হওয়ার ও ইতিকর্তব্য নির্ধারণের যৌক্তিকতা রয়েছে।

কবি শান্তিনিকেতন গড়েছিলেন, কিন্তু স্বদেশের অন্তরে-বাইরে কখনও – প্রজ্বলিত কখনও- ধূমায়িত বহ্নি তাঁকে শান্তি নিয়ে লোকান্তরিত হতে দেয়নি। হতাশাকে চিরন্তন মনে করার কবি ও মানুষ তিনি ছিলেন না, কিন্তু পরিণামে কোনো আশ্বাসের উষারাগও তিনি দেখে যান নি। না স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে, না স্বার্থ-সংঘাতী বিশ্বে। তবু অভ্যন্তরীণ স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর যে অভিযোগই থাকুক, সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণমূলক অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর স্বদেশ-গর্ব বারংবার সোচ্চারেই ব্যক্ত হয়েছে। জন্মভূমি থেকে চিরবিদায় নেওয়ার ঠিক দু'মাস আগে র‍্যাথ্ বোনের ভারত-নিন্দার প্রতিবাদে লেখা চিঠিতে তাঁর গভীর স্বদেশিকতার শেষ স্বাক্ষর মুদ্রিত দেখা যায়।

রবীন্দ্র-ভাবাদর্শে সমাজ ও স্বরাজ

রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক বিপ্লব এনেছেন, সামগ্রিক সমাজ-বিপ্লব ঘটানোর প্রয়াস করেছেন, কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিপ্লব আনতে চান নি। তাঁর ধারণায়, ভাবস্পর্শে মানুষ সচেতন হলে পর এবং সামাজিক সাম্যের অধিকার আয়ত্ত করলে পর নামতঃ রাষ্ট্র একটা থাকবে বটে, কিন্তু তার শোষণ শাসনের রূপ থাকবে না, শৃঙ্খল আপনা থেকে স্থলিত হয়ে পড়বে। যেমন তিনি ভেবেছিলেন যে ধনতন্ত্র বা শোষণ ক্রমে আপনা থেকেই হটে যাবে। শোষক বণিক তার জটিল কুম্ভীপাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে মরণাপন্ন কাতর হতে থাকবে, আর, সামবায়িক ও মেহনতী মানুষের একটা মাত্র আঘাতেই ভবলীলা সাঙ্গ করবে। আজকের দিনে – এই উনিশ শতক থেকে উত্তরোত্তর-রাষ্ট্রিক বা রাষ্ট্র-আর্থনীতিক সংগঠনটাই যে মানুষের মুখ্য সংগঠন এবং তা সমাজেরও প্রভু- এ তত্ত্বটা রবীন্দ্রনাথ বুঝেও বুঝতে চাইতেন না। এই নিয়ে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের বৈপরীত্য উপলব্ধি তাঁর প্রারম্ভিক বিশ-শতকীয় ভাবনা-চিন্তার একটি দিক যা থেকে তিনি পরে অবশ্য খানিকটা সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। র‍্যাথবোনের লেখার জবাবে তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিলেন তাতে এই বোঝা যায় যে সমাজের উপর রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব তিনি অনুমানই করে নিচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, কী প্রাচীনে কী মধ্যযুগে ভারতবর্ষের শক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্র নয়, সমাজ। "হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি" "হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে" প্রভৃতি কবিতা এবং 'স্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে এইসব তত্ত্বেই দেখা যায়। কালিদাসের রঘুবংশে এবং শকুন্তলায় ভারতীয় রাজাদের শাস্ত্রশাসিত এবং অ-সার্বভৌম হিসাবেই দেখা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতও কবির ধারণার উৎস হতে পারে। কিন্তু এটা সেকালের সমাজরাষ্ট্রকে দেখার একটা দৃষ্টিকোণ মাত্র। এর অন্যপৃষ্ঠা হল অগণিত দীন ও নিরক্ষর শূদ্রদের পশুতুল্য রেখে তাদের শোষণে সমাজ ও রাষ্ট্রের, অর্থাৎ শাস্ত্র ও শাসনের পারম্পরিক অনুবর্তীতা। ক্ষাত্র এবং ব্রাহ্মণ্য দুয়েরই স্বার্থ ছিল একই সূত্রে বাঁধা, তাই পারস্পরিক আনুগত্য। সেই জন্যই রাজা বর্ণাশ্রমের রক্ষাকর্তা হিসাবে বারংবার উৎসাহিত, আর সেই কারণেই শাস্ত্রকাররা রাজদরবারে ভূমিদান অর্থদানের দ্বারা সংবর্ধিত। রাজা অশোক ব্রাহ্মণ্য সমাজ- শাসনে উদ্‌বুদ্ধ না হয়ে নিজ মানবিক প্রবণতা অনুযায়ী নোতুন অনুশাসন তৈরি করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কলিঙ্গরাজ খারবেল এবং আরও কেউ কেউ প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সমাজ- আধিপত্যের বিরোধী স্বকীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। এটাই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষীয় আপামর জনসাধারণের সমাজ সর্বেসর্বা হয়ে রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করেছে- এ ধারণা কার্যক্ষেত্রে সর্বতোভাবে ঠিক নয়। বরং এটাই বেশি ঠিক যে রাজা বা রাষ্ট্র বিদ্যাবুদ্ধি-প্রধান ব্রাহ্মণ্য সমাজকে হাতে রেখে

বর্ণভেদ খাড়া করে উৎপাদন-বণ্টন যন্ত্রটাকে দখলে এনেছে। নব্বই ভাগ মানুষকে স্বাধিকার না দেওয়ার ব্যাপারে ক্ষত্রিয়- ব্রাহ্মণ্য একই গোত্রের। এই কারণেই ক্ষত্রিয় রাজারা খুব যাগযজ্ঞ করিয়েছেন, দেবালয় নির্মাণ করেছেন অজস্র। এই প্রবণতা সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারীর দল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। অজস্র দেবালয় তাদের প্রজা ঠিক রাখার অর্থাৎ উৎপাদন নিজ আয়ত্তে রাখার রাজনৈতিক কৌশল। সাহিত্যে ও ইতিহাসে এরকম কৌশলের বহু পরিচয় ছড়িয়ে আছে। এক একটা মন্দির-বিহার প্রচুর ধনসম্পত্তির যেমন আশ্রয় ছিল, তেমনি ছিল নিরক্ষর প্রজাদের গুরুতর সম্ভ্রমের বস্তু। এই কারণেই সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন, এই কারণেই বখ্‌তিয়ারের বহু বিহার ধ্বংস। রাজনৈতিক শক্তির উৎস চুরমার হবে, ধনসম্পদও হস্তগত হবে, এই ছিল প্রথম মুসলিম অভিযাত্রীদের কৌশল। তা কোনো সাম্প্রদায়িক ব্যাপার ছিল না।

পাঠান- মোগল আমলে হিন্দুসমাজ আহত হয়নি, কারণ, সুলতানী শাসনে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্যবস্তু ছিল অর্থ ও আধিপত্য আর, জাতিবর্ণ বিভাগের স্থিতিবস্থা বিঘ্নিত করে প্রয়োজনীয় অর্থ সমাহরণ কুঠারাঘাত করতে তাঁরা চাইবেন কেন ? এই জন্যেই পাঠান-মোগল শাসনে এত সাহিত্যের উন্নতি, হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ এবং হিন্দু জমিদারদের সংখ্যাধিক্য। এই হিসাবেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করে হয়তো বা বলা যায় যে মধ্যযুগে সমাজই বিদ্যাদান অন্নদান করেছে, সমাজই রাস্তাঘাট পূষ্করিণী নির্মাণ করেছে। নতুবা পাঠান-মোগল সুলতানেরা তাঁদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখতে ও বাড়াতে কী প্রতাপ দেখিয়েছেন, আলাউদ্দিন খিজজী থেকে ঔরংজেব পর্যন্ত তার প্রমাণ। প্রজাপক্ষে থেকে প্রাপ্য করের অনাদায় বা সমাজ- বিপ্লবে অনাদায়ের সম্ভাবনা দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে তাঁরা কৃপণতা করতেন না। এই কারণেই কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক পক্ষপাত দেখানোর ব্যবস্থা তাঁরা করেন নি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও তখন দেখা যায়নি। শ্রীচৈতন্যের নবধর্ম আন্দোলনে পুরাতন ব্রাহ্মণ্যপন্থী হিন্দুরা প্রতিদিন কাজীর কাছে অভিযোগ করলে পর, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলায় প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা যেতে পারে, এই ভয়ে কাজী ঐ আন্দোলন বন্ধ করার জন্য একটা প্রাথমিক উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন। পরে যখন বুঝলেন ওসব মুষ্টিমেয় কিছু লোকের 'লাগানি' মাত্র এবং এতে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কোনো কারণ নেই, সাম্প্রদায়িক গোলমালের কোনো ভয় নেই, তখন তিনিও বিরূপতা ত্যাগ করেছিলেন।

সমাজের উপর রাষ্ট্রের জবরদস্তি হস্তক্ষেপের একটি বড় দৃষ্টান্ত হল বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেনের কৌলীন্য প্রথা চালানো এবং পাকাপাকিভাবে জাতের ভেদ তৈরি করা। সেন রাজারা দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন, যে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজাদের সময় থেকে গুরুতর ব্রাহ্মণ্য আচারবিধি আনতে রাজারা উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

বৃত্তি হিসাবে মানুষের বিভাগ নয়, বর্ণ এবং জন্ম ধরে বিভাগ, এই সেনরাজাদের সময় থেকেই বাঙলায় পাকাপাকি চালু হয়ে যায়। বিশেষ একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে আগত ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়দের অনুকূলে সম্পদ বণ্টন পরবর্তীকালে যেমন তাদের নিজেদের তেমনি দেশের দুর্বিপাকের কত বড় কারণ হয়েছিল তা ছাত্রদেরও অজানা নয়। এই অমানবীয়, যুক্তিহীন ও অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধেই শ্রীচৈতন্যের বিদ্রোহ, যা কিছুটা কার্যকরী হয়েও শেষ পর্যন্ত যে হল না, তার কারণ, এটি কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল, এতে রাষ্ট্রের কোনো পক্ষতা- বিপক্ষতা ছিল না। সেন রাজারা যে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-শাসন –মূলক ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন তা বৈষ্ণবীয় ভাবপ্লাবনে কিছু কালের জন্য ডুবে রইল মাত্র, বন্যার জল একটু সরে যেতেই আবার মাথা তুলে দাঁড়াল শাক্ততান্ত্রিক জমিদারদের সহায়তায়। এখানেও দেখা যায় বড় বড় ভূমিধিকারীরা সেই সমাজকেই নির্বাচন করে প্রাধান্য দিতে থাকলেন, যে সমাজ শাক্ত-ব্রাহ্মণ্য- তন্ত্রের পোষক। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কেবল নরপতি বলেই নয়, সমাজপতি বলেই উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন শাস্ত্রে দীক্ষিত সাহিত্যিকেরা। সুতরাং কবিগুরুর ভাবুকতাময় এই ধারণা, যে, দেশে সমাজই প্রধান ছিল, রাজারা ছিলেন সমাজের দাস, এ তত্ত্ব ধোপে টেঁকে কিনা সন্দেহ। যদি তা কতকটা ঠিকও হয় তাহলে বুঝতে হবে পাঠান-মোগল আমলের সমাজ-ব্যবস্থাকেই রবীন্দ্রনাথ তখনকার মত মনে রেখেছিলেন। নব্বই শতাংশ অশিক্ষিত সাধারণ ও লৌকিক দীন মানুষের শৃঙ্খলিত অবস্থায় দিকে চেয়ে সামগ্রিক অধ্যায়নের কথা বলেন নি। যাকে বলেছেন গৌরবময়, তা যে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সুবিধা সমাহরণের ও শোষণের সখ্যসম্পর্কে আবদ্ধ তা তখনই তাঁর উপলব্ধ হয়নি, অবশ্য পরে হয়েছে, এই রক্ষা।

বিপ্লব বাঙলায় বার তিনেক এসেছে, এসেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হিসাবেই। তা সমাজদেহে প্রবেশ করে মানুষের মনের গঠন কিছু কিছু বদলেছে। আর, সেই উপকরণ নিয়ে তার জীবনে ও সাহিত্যে কিছুদিন ধরে নোতুনের প্রেরণা চলেছে। কিন্তু দার্শনিক ভিত্তির ভাববিপ্লবের সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লব মিললে যে- পরিবর্তন সামগ্রিক হয়ে দেখা দিতে পারে, তার স্বাদ বাঙালী-জীবনে আসেনি। কোমল-ভাব সহায়বন্ধুহীন, রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সহগামী হলেই সে স্থায়ীভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে, নতুবা নয়। ইতিহাস পাওয়া যায় না, এমন কোনো দু'চার শতাব্দী ধরে অস্ট্রিক মিশ্রিত বাঙলায় জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়ে পশ্চিম থেকে আর্য-অনার্য বিমিশ্র সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এর ফলে তখন কী অবস্থা থেকে কোন্ রূপান্তর এসেছিল তা অনুমানের বিষয় মাত্র। হয়তো রাঢ়বাসী অস্ট্রিকেরা তাদের দুর্ধর্ষতা কিছুটা ত্যাগ করেছিল, এবং চাষের কাজে মন দিয়েছিল, হয়তো গাছ পাথর এবং নৈসর্গিক উপদেবতার সঙ্গে জৈন তীর্থংকরদের ও বোধিসত্ত্বের মূর্তির পূজাও ধরেছিল। তার পর পশ্চিম থেকে ব্যবসায় সম্পর্কে বা রাষ্ট্র সম্পর্কে

অনুপ্রবেশকারী ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের লোক এসে জোতজমি করায়ত্ত করেছে, আর দ্রাবিড় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ তাদের আধিপত্য ও ভাষা স্বীকার করে নিম্ন সম্প্রদায়ে স্থান করে নিয়েছে। অন্যদিকে অনার্যেরা অরণ্যের অধিকার থেকে যেমন বিচ্যুত হয়েছে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ে দান করেছে তাদের বিশিষ্ট ধারণা ও সংস্কার, ভাষারীতি ও পঞ্চায়েতী সমাজ-বিন্যাস প্রভৃতি। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে এই মূল অনার্য সংস্কার বাহিত কথা- কাহিনী ও তার উপর ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক উপাদানের আরোপের ব্যাপারটি লুকিয়ে রয়েছে। এসব নিয়ে আধুনিক গবেষকরা বেশ কিছু আলোচনা করেছেন, সুতরাং বাক্য ব্যয় বাহুল্য মাত্র। আমাদের দর্শনীয় হল লৌকিক সমাজ–বিন্যাসের উপর রাষ্ট্রীয় তদারকি। সেনরাজারা উচ্চশ্রেণীর মানুষের অধিকার নিয়ে যে সমাজ-বিন্যাস করেছিলেন, যাকে মোটামুটি ভারতীয় সমাজ-বিন্যাসের প্রতিধ্বনিও বলা যায়, যার ধাক্কা আজও আমাদের সামলাতে হচ্ছে, তার সঙ্গে পাঠান-মোগল বাদশা'দের বা ইংরেজ সরকারের তেমন কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বাঙলার সমাজ-শাসন যেসব ভূম্যাধিকারীদের হাতে ছিল তাদের অধিকাংশই উচ্চ বর্ণের হিন্দু, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রমতে পুরোপুরি আস্থাবান। ইংরেজ আমলেও এঁদের আধিপত্যের অনাথা হয়নি। সুতরাং একথা বলা বোধহয় ঠিক হবে না যে সমাজ-শাসন করতেন সমাজেরই লোক, রাজা-জমিদারেরা থাকতেন নিরিবিলিতে। ছোট ছোট রাষ্ট্রীয় প্রশাসন অব্যাহত রাখার জন্য তাঁরা যেভাবে ছোট বড় বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করতেন, লোক নিয়োগ করতেন এবং জোতজমির বিলি ব্যবস্থা যেভাবে নিতেন তার পরিচয় বাঙলার ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা। মুসলিম সুবাদার বা রাজকর্মচারীরা এসব জমিদারতান্ত্রিক সমাজ-বিন্যাসে হস্তক্ষেপ করতেন না। ইংরেজরা তো তাঁদের নিযুক্ত জমিদারদের উপর গ্রামীণ প্রশাসনে যা-খুশী –তাই করার অধিকার দিয়েছিলেন। ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা এই – উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য এবং জমিদার মিলিতভাবে পুরানো প্রথা এবং ধর্মীয় ব্যবস্থাকে পাকা করেছেন, যার কোনো প্রতিবাদ মেহনতী নিম্নবর্ণের মানুষের কাছ থেকে আসার কোনো কালে কোনো সম্ভাবনাই হয়নি।

জৈন- বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যের অভিঘাতে অনার্য বাঙলায় প্রথম সংস্কৃতিক বিপ্লব এবং নোতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যদি কিছু এসে থাকে তা তার কাছে বিনা বাক্যে আত্মসমর্পণে, ও কাল্‌ক্রমে রাষ্ট্র-সহযোগী সমাজে বিভেদমূলক শাস্ত্র ও প্রথার প্রবর্তনে। সহজ মানবিকতার ধর্ম বিলুপ্ত হবার মত হলে তার প্রতিঘাতে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের উদ্ভব। এ-বিপ্লব আনলেন শ্রীচৈতন্য। এ বিপ্লব কৃত্রিম শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, জ্ঞানের আভিজাত্যের বিরুদ্ধে, ভাবমূলক লোকধর্মে হীন পতিতের এমন কি হিন্দু-মুসলমানের সমানাধিকার ঘোষণায়। নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা ভাববিপ্লব, স্বল্প সময়েই যার অপ্রত্যাশিত বিস্তার। কিন্তু যেহেতু এ বিপ্লব সামগ্রিক হয়নি অর্থাৎ কেবল ভাবের দিক থেকেই নয়, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রেও অর্থাৎ রাষ্ট্রে এবং

উৎপাদনমূলক আর্থিক শক্তিতেও এতে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল না, সেজন্য বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এল না। ভাবের বন্যা ধীরে ধীরে অপসৃত হতেই সেই পুরাতন ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য, সেই শাস্ত্র ও প্রথার অত্যাচার নোতুন করে প্রাবদ্ধ হল দুর্গা-চণ্ডী-মহিমা মূলক শাক্তধর্মের ঘোষণায়। লোকধর্ম চলতে লাগল সমাজের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে। জমিদারতান্ত্রিক বাঙলায় মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের আধিপত্য জাতপাঁতের বিভেদকে আরও প্রবল করে তুললে। ঠিক এই অবস্থায় এসে পড়ল বাণিজ্য- সম্বল বিদেশী শাসন যা এদেশীয় সমাজস্থিতি বিষয়ে উদাসীন থেকে শোষণ-সহায় বুর্জোয়া সমাজ গড়ে অভিনব শ্রেণীভেদের প্রতিষ্ঠা করলে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের কিছু চৈতন্যের জাগরণ হল, কিন্তু অগণিত সাধারণ মানুষ কেবল তিমিরেই রইল না, ঘৃণায় দারিদ্র্যে ও নয়া জমিদারির দাসত্বে পশুর মত জীবন যাপনে বাধ্য হল। একেই নব্য-সুবিধাভোগী কেউ কেউ রেনেসাঁস আখ্যা দিতে লাগলেন, সাম্রজ্যবাদী শ্রেণীস্বার্থের দালালিতে নিমজ্জিত হয়ে। বলা বাহুল্য, সে রেনেসাঁস আজও আসেনি, স্বাধীন ভারতের পশ্চিমা-অর্থনীতির অনুকরণে তা আসবেও না, সম্ভাবতঃ গুরুতর প্রতিঘাত না পাওয়া পর্যন্ত।

তবু ভারতের কোনো কোনো অংশে কৃষক-শ্রমিকের অধিকারবোধ জাগরিত হতে শুরু করেছে এবং যে আদর্শ নিয়ে সে জাগরণ ঘটছে তা কেবল সাম্যধর্মী রাজনৈতিক আদর্শই নয়, তাতে দেশীয় সাহিত্যিকদের ভাবগত যোগসাধনও নগণ্য হয়নি। আর এইখানেই নবসমাজ গঠনের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত আবদান। যে বিপ্লবাত্মক রেনেসাঁস আসবেই, কবিগুরু তারই স্বপ্নদ্রষ্টা এবং প্রবল প্রেরণাদাতা। রাষ্ট্র-পরিবর্তন অর্থাৎ স্বাধীনতা তিনি অন্তরে চাননি এমন নয়, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ তিনি অবগতই ছিলেন, কিন্তু যে আন্দোলনের ফলে স্বরাজ অনায়াসে আয়ত্ত হবে সে-বিষয়ে তাঁর ধারণা চলমান স্বাদেশিকদের থেকে বিভিন্ন ছিল। তিনি নরমপন্থী জাতীয় কংগ্রেসবাদীদের আবেদন- নিবেদনকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন, গান্ধীজীর চরকা-অসহযোগকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছেন এবং গুপ্ত স্বদেশীদের ভুল সংশোধন করতে চেয়েছেন। ইংরেজ শাসনের প্রতি ঔদাসীন্য সহকারে গ্রাম-স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-সহায়ে জনসংগঠন, সমবায় আশ্রয়ে আর্থনীতিক আত্মসংগঠন প্রভৃতি বৈদেশিক শাসনকে অর্থহীন করে তুলবে এবং সেই সঙ্গে কর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শ্রেণীবিভেদ অপসারিত হলে সার্থক স্বাধীনতা করায়ত্ত হবে এ-ই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁর কাছে সংগ্রামের অর্থ ছিল এটাই এবং প্রবন্ধে ও ভাষণে এই উদ্‌যোগের জন্য তিনি যেমন প্রচুর শক্তি নিয়োগ করেছেন, তেমনি গ্রাম-বাঙলায় কর্মক্ষেত্রও রচনা করেছেন। কাব্য-কবিতায় ‘এবার ফিরাও মোরে’ থেকে আরম্ভ করে শেষ দিন পর্যন্ত সর্বস্বপণ সংগ্রামের যে উদ্দীপনা তিনি দিয়েছেন তা রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার পক্ষে নয়, বরং আরও দুরূহ ঐ গ্রাম-সংগঠনের পক্ষে। তবু, দীনচিত্ত ও সাম্রাজ্যবাদী বণিক-সভ্যতার সহায়ক শিক্ষিত বাঙালীকে

মানবিকতার অভিমুখে জাগানোর জন্য যেসব কাব্য-কবিতা তিনি লিখে গেছেন তা বিপ্লবাত্মক সশস্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান বলেই বীর স্বাদেশিকদের কাছে গৃহীত হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেন নি এমনও নয়। বলেছেন অচলায়তনে, ভালোভাবেই আভাস দিয়েছেন বলাকা, রক্তকরবী, মুক্তধারায়, আর প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভের বছরে লেখা 'শান্তিনিকেতন' এর ভাষণমালায়, একেবারে স্পষ্টাক্ষরে। তাঁর ' ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা' প্রভৃতি, "এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা" " অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু", "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান", "অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে", "যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল" এবং "ভাঙনের জয়গান গাও" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি গুপ্ত স্বাদেশিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই চালিত করেছে। আবার, রবীন্দ্র-সাক্ষ্য নিয়েই নজরুল এবং সুকান্ত পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ এবং বণিকতন্ত্রের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামের কথা উচ্চারণ করেছেন। প্রবন্ধে এবং ভাষণে – কালান্তর , সমবায়নীতি, পল্লীপ্রকৃতির প্রবন্ধাবলীতে –আধুনিক সমস্যা বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ এবং সেই সঙ্গে বিশ্বমনা রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন স্বাদেশিক স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেননি, বাস্তবতাহীন এবং কেবল ভাবুকতাময় বলেই হয়ত বলেন নি, অথচ কাব্য-কবিতায়-নাটকে তার আভাস দিচ্ছেন, এই দ্বিচারীতার সমাধান কে করবে? রক্তদানের দ্বারা বাধা-প্রতিবন্ধককে সম্পূর্ণ অপসারিত করো, বিচূর্ণ করে ফেলো জীর্ণ পুরাতন রক্ষণশীলতা – এই সুতীব্র উৎসাহের বাণী- এ তো গ্রাম-সংগঠনে উদ্যোগী অথচ আশাহত সেই মানুষটিরই, যিনি সামগ্রিক বিপ্লব চেয়েছিলেন, কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করায় পরিতৃপ্তি বোধ করতে চান নি।

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-স্বরাজ ধোপে টিকত কিনা, তার পরীক্ষা হয়নি, তবে দেখা গেছে, কংগ্রেসী নেতাদের অযৌক্তিক কালহরণে হতাশ হয়ে একদা নেতাজী সুভাষ এবং গোলটেবিল বৈঠকের অসাফল্যে গান্ধীজী গ্রাম-সংগঠনে মন দেওয়ার সংকল্প নিয়েছিলেন। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রাম-সংগঠনের কর্মসূচীতে এতদূর আস্থাবান ছিলেন যে রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর কার্যক্রম দেখে শুনে আসার পরও তাঁর মৌলিক পরিকল্পনা থেকে সরে আসার প্রয়োজন বোধ করেননি। রাষ্ট্রের সহায়তা না থাকলে উদ্যোগ কিভাবে এগিয়ে চলবে তাও ভালো করে ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিবেচনা করেন নি যে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবে ও শাস্ত্রপ্রথার দাসত্বে জর্জর বিমূঢ় জাতটা সামগ্রিক বিপ্লবে মনোযোগী না হলে চারিত্রিক শুদ্ধি এবং তারই ফলে কর্মশুদ্ধিতে আত্ম-উৎসর্গ করবে কিভাবে? প্রশাসন হাতে না থাকলে সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক দুই প্রবল শতরুর হাত থেকে মানুষের পরিত্রাণই বা হবে কিভাবে। তবু কবির গ্রাম-স্বরাজ ইউটোপিয়ার সপক্ষে কিছু বলারও আছে। স্বাধীনতা-উত্তর আজকের ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অক্ষম অবস্থাদৃষ্টেই সেকথা বলতে হচ্ছে। জাতিবর্ণবিভেদমূলক শ্রেণীশোষণ বিলুপ্ত

করার সুদৃঢ় পদক্ষেপ কোনখানে ? পশুবৎ ব্যবহৃত অগণিত মানুষের শিক্ষা এবং ঠিকমতো বাঁচার অধিকার আজও আশার পথে নয় কেন? তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর জঘন্য স্বার্থপর ও কূটকৌশলী চরিত্র দেশকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে? যাঁরা বিবেকী তাঁরা সামনে কোনো আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছেন? আমি গোটা ভারতের দিকে চেয়েই একথা বলছি, বাঙলার বামফ্রণ্ট সরকারের জনহিতকর পদক্ষেপগুলির বিষয়ে সপ্রশংস মনোভাব রেখেও বলছি। বিলম্বিত ন্যায়-বিচার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিরই সামিল। পুঁজিবাদ-মুখী আর্থনীতিক পীড়নে অসহায় নিঃসম্বল মানুষ ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে পর যে সমাধান ও কবরের শান্তি আসবে তাকে মানুষের মুক্তি বলবেন? কথা এই যে, সেই আগেকার স্বদেশী আন্দোলন এবং উত্তরোত্তর প্রবল সাম্প্রদায়িকতার বিষয় স্মরণ করেই আমরা বলতে বাধ্য যে প্রকৃত সংগঠনের অন্তে স্বাধীনতা এলে পর, বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টি হলে পর, আজকের পথ – খুঁজে –না- পাওয়া গুরুতর জাতীয় দুর্ভোগ থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যেত, বণিক- নিষ্পেষণ এবং সেই সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় অগ্রসর চারিত্রিক অধঃপতন এত তীব্র হয়ত হত না।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির লোক ছিলেন না, ইংরেজ-পক্ষপাতীও বিন্দুমাত্র ছিলেন না। রাষ্ট্র যেমন চলছে চলুক, আপনা থেকেই তাকে যেতে হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে, আসুন, আমরা অভ্যস্ত হই এবং অনায়াস বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করতে থাকি, এই ছিল মোটামুটি তাঁর গ্রাম-উন্নয়নমূলক ভাবী স্বরাজের আদর্শ। ভাব এবং কর্মকে তিনি একসঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন, কর্মে পারেননি, কিন্তু ভাবুকতায় আজও অপরিম্লান রয়েছেন। স্থূলতা বৈষয়িকতা পরিহার করে সৌন্দর্যে এবং জ্ঞানে মুক্তির বিষয়, কবিতায় যা অনুভব করেছিলেন, তার বাস্তব কর্মরূপ দিতে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে। বাস্তব নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, তার আদর্শ মূর্তিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে অবিচল হয়ে কবিতায় নিবন্ধে,- আজ অবমানিত হলেও যা সত্য। গ্রাম-সংগঠনের আদর্শ আজকের পঞ্চায়েতের রূপে কিছুটা কার্যকর হতে চলেছে বাঙলায়, কিন্তু ভাবাদর্শে স্বপ্নে এই বিপ্লবী কবি যা অনুভব করেছিলেন সেই সমগ্রতা কখন সুলভ হবে কে জানে? তবে আন্তর্জাতিক আদর্শে আজকের আত্মশোধন ও প্রগতির পূর্ব দিশারী হিসাবে কবি চিহ্নিত থাকবেন বহুদিন, তাঁর কল্পনাদৃষ্টি নিঃসীম মানবিকতা আয়ত্তে না এলেও। আর "শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, শরমের ডালি" নিয়ে আজকের শিক্ষিত সুবিধাবাদীরা আসরে কক্ষে আসন নিতে ও ভাষণ দিতে থাকলেও, হে কবি, তোমার বাণী নিশ্চয়ই তাদের চিত্তকে তৃণসম দগ্ধ করতে থাকবে, তোমার বারংবার উচ্চারিত জড়ত্বমুক্তি অর্থাৎ সম্যক বিপ্লব যতদিন না আসে। তবু আসুন, আজকের এই চোদ্দশ' সালের প্রারম্ভে বাঙলার পরিবর্তমান আকাশপটে পূর্ণতর দীপ্তিতে নবরবির আর্বিভাব কল্পনা করে খানিকটা আশ্বস্তও হওয়া যাক।

মানুষের সপক্ষে মহাকবি

এই আধুনিক গীতি- মহাকবির সূক্ষ্ম অথচ ব্যাপক কবিকল্পনায় নিসর্গপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য যেমন ধরা দিয়েছে, তেমনই সাড়া জাগিয়েছে ভারতীয় মানুষ-জীবনের চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নৈরাশ্য থেকে অভ্যুদয়ের বিজয়বার্তা ও পথনির্দেশ। মহাকবিরা তাঁদের প্রায় অজ্ঞাতেই ভাবীকালের জাতীয় জীবনের ভূমিকা রচনা করে যান, রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন, এজন্য তিনি আমাদের সম্ভাবনাময় জাতীয় মহাকবি। কেবলমাত্র নিসর্গ-সৌন্দর্যের রহস্যময় ইন্দ্রজাল রচনায় মহাকবিত্ব সিদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ।

তাঁর গতিশীল কাব্যজীবনের দিকে লক্ষ্যপাত করলে দেখা যায়, সুদূরচারী স্বপ্ন ও আবেগ নিয়ে এর যাত্রা, অকারণ বিরহ-বিকার এর কেন্দ্রবিন্দু, নিসর্গ-সৌন্দর্য-বিলাস এর পরিমিতি, ব্যক্তিগত বিচিত্র বাসনা হল এর দিগন্ত-প্রসার। এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ প্রবল রোম্যান্টিক মনোভাব নিয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর বিশিষ্ট কবিস্বভাব বিন্দুমাত্র রক্ষণশীল বা স্থাবর-প্রকৃতির ছিল না, ছিল একান্তভাবেই চলিষ্ণু, সেইজন্য সাধারণ প্রকৃতি- প্রীতিকে অতিক্রম করে পরিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ, ঋতুপর্যায়ের আবৃত্তির মধ্যে জীবনের চিরনবীনতার সংকেত, সাম্প্রতিক পারমাণবিক আবিষ্কার ও মহাকাশ-গবেষণার সঙ্গে কবিকল্পনাগত সত্যের সামঞ্জস্য অনুভব- এসব যেমন তাঁর কবিতায় ও গানে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অভিভূত হয়েই দেখতে হয় রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের প্রভাবে বিবর্তিত সমাজ-জীবনের অগ্রগতির সপক্ষতা আর এরই সূত্রে কর্মী মেহনতী মানুষের ত্যাগ ও বীরত্বের মহিমা উপলব্ধি।

বস্তুত কবি রমণীয় সৌন্দর্যের ও শব্দবিন্যাসের মায়া সৃজনে অদ্বিতীয় হলেও চলিষ্ণু ও সংগ্রামী মানুষের দুঃখময় জীবন-সংঘাতেরও নিয়ত সঙ্গী হয়েছেন-হয় কাব্যে ও নাট্যে, নয় প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, কর্মে ও নানান্ বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে। কবির উল্লিখিত দুই পৃথক্ মনোভঙ্গির বিবর্তনের একটি লেখচিত্র অর্থাৎ গ্রাফ্ যদি এঁকে দেখানো যায়, তাহলে প্রায় গাণিতিকভাবে ধরা যেতে পারে যে সৌন্দর্যবিলাসের রেখাটি প্রথম কাব্যজীবনে যে-পরিমাণ সমুন্নতি-অঙ্কে, মধ্যজীবনের পর থেকে মানবসমাজ –সপক্ষতা ক্রমশ সেই পরিমাণই শীর্ষে উঠে গেছে। প্রথম কাব্যজীবনে অর্থাৎ সোনার-তরী, চিত্রা, কল্পনা, খেয়া প্রভৃতি রচনাকালে মানুষ-প্রীতি ও সমাজ-নিষ্ঠা কবিকল্পনায় গৌণ এবং নিসর্গরেখার বেশ নিচে, যদিচ দু' একটি ক্ষেত্রে একালেও সমাজভাবনার উন্নত দৃষ্টান্ত দেখা যায় (যেমন "এবার ফিরাও মোরে" কবিতা)। কিন্তু লেখচিত্রের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ মহাযুদ্ধোত্তর বলাকা, মুক্তধারা, রক্তকরবী, মহুয়া, চণ্ডালিকা, কালের যাত্রা, তাসের

দেশ প্রভৃতি থেকে পুনশ্চ, পত্রপুট, জন্মদিনে পর্যন্ত রচনায় কেবল প্রকৃতির প্রতাপ ক্ষীণ হয়ে এসেছে ,বরং বেজে উঠেছে মানুষরই জীবনযাত্রার সংকেত। এই মানুষ অবিরাম নোতুন পথের যাত্রী, এই মানুষ নিতান্ত সাধারণ অবহেলিত নিরন্ন শীর্ণ মানুষ- বিবেকানন্দের ভাষায় ভারতের চলমান শ্মশান। শুধু তাই নয়, একালেও কবিচিত্তে প্রকৃতির আধিপত্য যেখানে রয়েছে এমন ফাল্গুনী, নবীন, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুনাটোও ব্যঞ্জিত হয়েছে মানুষেরই উত্থান-পতন- বন্ধুর পথে অবিশ্রান্ত চলার জয়ধ্বনি।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে, কুহেলীমক্ত স্পষ্ট ভাষায় কবি যেখানে যুক্তি ও অনুজ্ঞার পথবর্তী হয়েছেন, সেখানে, ঐ দ্বিতীয়ার্ধে, এমন প্রত্যক্ষ মানবিকতার দৃষ্টান্ত প্রচুর। হিন্দু-মুসলিম মিলন- সম্পর্ক গড়ে তোলার আগ্রহ, অশিক্ষা ও অনাহারে নিপীড়িত অনুন্নত সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলমোচন ও গ্রাম-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লেখাসমূহ, কালান্তরের প্রবন্ধাবলী, রাশিয়ার চিঠি, সমবায়, পল্লীপ্রকৃতি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গদ্যে রচনার সঙ্গে কবিতাবলী মিলিয়ে নিয়ে বলা যায় কবির সমাজভাবনা কেবল ভাববাষ্পাকুল ছিল না, নিঃশেষে ধ্রুব এবং প্রত্যক্ষভাবে আন্তরিকই ছিল। আবার এরই সঙ্গে কবির কর্মের উদ্‌যোগকে- প্রথম অধ্যায়ে শিলাইদহ – পরিসরে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনিকেতন- যদি মিলিয়ে নেওয়া যায় তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর প্রাকৃতিক রহস্যস্বপ্ন বাস্তব মানবিকতার লীন হয়ে চরিতার্থ হয়েছে। এ কবি যথার্থই ক্রান্তদর্শী, দেশ ও জাতির উন্নয়ন-প্রয়াসের জন্য সুচিরকাল স্মরণীয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবির এই একান্ত মানুষ-সপক্ষতার দিকটি বহুকাল উপেক্ষিত থেকে গেছে, দীর্ঘকালের পরাধীনতা ও শ্রেণীস্বার্থের সংস্কার আমাদের চিত্তেন্দ্রিয়কে এতই অসুস্থ ও সংকীর্ণ করে তুলেছিল যে আমরা তাঁর স্বপ্নরচনাতেই মোহাবিষ্ট ও সুখী ছিলাম। যেখানে কাব্যার্থ ধরতে পারিনি সেখানে এই মনে করে আত্মতুষ্টির সন্ধান করেছিলাম যে, কবি উপনিষদের বাণীগুলি পুনরায় বলছেন এবং সর্বত্র ঈশ্বরের দিকেই অঙ্গুলিসংকেত করছেন। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাঁর সমাজমুখীতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমাদের পরমপ্রিয় শান্তি অহিংসা রক্ষণশীলতা এবং কপট ঈশ্বরপ্রীতির রঙে ডুবিয়ে মনগড়া এক ঋষিকে প্রতিষ্ঠিত করেছি জীবনমুখী যথার্থকবির জায়গায়। সুখের বিষয় এই ধরণের অবুদ্ধি ও কপটতা-বিজড়িত স্বপ্নমোহের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আজকের কালান্তরে কবি তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবিচিত্তে স্বদেশীয় মানুষসমাজের অভিঘাত সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে নিতে ক্ষতি নেই।

কবিচিত্তের প্রথম পরিস্ফুট স্বপ্নমুক্তি ঘটেছিল তিরিশোত্তর বয়ঃক্রমে, বিখ্যাত ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতায়। তার আগে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অবস্থায় অপ্রকাশের বেদনার সঙ্গে হয়তো বা সামাজিক অবরুদ্ধতার অনুভবের যোগ ছিল,

‘ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্’- এরকম প্রবল প্রতিবাদী উচ্চকণ্ঠ তার প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু ‘এবার ফিরাও মোরে’ একালকার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য- আসক্তির অবসরের একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। কবিতাটি তখনকার বিপ্লবীদের কী পরিমাণে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল তা হয়তো সকলেরই জানা। কিন্তু যে-অসহায়তার করুণ ছবি কবিকে এ ধরনের বৈপ্লবিক আক্ষেপ ও উৎসাহের বাণীপ্রকাশে অনুপ্রেরিত করেছিল তা হয়তো অনেকের জানা নেই। তা হল জোতদার-জমিদার- মহাজন –কবলিত ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের জীবনধারা। এর ছবি ফুটেছে ঐ কবিতায় নিচের পঙক্তিগুলিতে- ‘স্কন্ধে যত চাপে ভার/ বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার/ তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি/ নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি/ মানবেরে নাহি দেয় দোষ,’ – ইত্যাদি। এই ছবি কল্পনাপ্রবণ কবিকে স্বল্প পরেই গ্রাম-উন্নয়নের ও দরিদ্র কৃষকদের পরিত্রাণের কাজে নিয়োজিত করেছে। কবি এই মূঢ় মূক শোষিত জনতাকে কী পরিমাণ ভালোবেসেছিলেন তার পরিচয় রেখেছেন, একালকার “ ছিন্নপত্রাবলী” তে – “ এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে- এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো – নিরুপায়- তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই ..... সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে-যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ বড়ো হতভাগ্য!” এবং “আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি- এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে” ইত্যাদি।

কবির শিলাইদহ-বাস এবং মাটি ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের প্রভাব তাঁর কাব্যিক পৃথিবীপ্রীতিকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে (‘বসুন্ধরা’ কবিতা দ্রষ্টব্য)। বলা যেতে পারে, এরকম আশ্চর্য পৃথিবীপ্রীতি কেবল কল্পলোক থেকে নেমে আসে নি, এর পিছনে বাস্তব শক্ত ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতার ঐ সহসা-আগত উত্তুঙ্গ বাস্তবতা পরের বেশ কয়েক বছরের মধ্যে আর পুনরাবৃত্ত হয়নি। ঠিক এসময়ে নিসর্গ- কল্পলোকেরই প্রাধান্য। কেবল ‘মালিনী নাটকে রাজকন্যার জনগণের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়ার প্রবল বাসনায় উক্ত মানবিকতার খানিকটা অনুসৃতি ঘটেছে, আর পরের কাব্য ‘চৈতালির’ মধ্যে অবহেলিত মানুষের প্রতি করুণার স্বাক্ষরে এসে কবির এ ভাবনা আপাতত নিবৃত্তিলাভ করেছে। হতে পারে যে, পল্লী-স্বরাজ সৃষ্টির চিন্তাভাবনা কাব্যে তাঁর মানুষ-সম্পর্কিত আবেগকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত ও স্তিমিত করেছে। চার-পাঁচ বছর পরে লেখা কল্পনাকাব্যের সময়ে ভাবাদর্শের প্রেরণায় কবি “হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে কবর মোরা পরিহাস” এবং “শুধু দিন-যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি” প্রভৃতি স্মরণীয় বাক্য গ্রন্থন করেছেন। এগুলির মধ্য দিয়ে তখনকার শ্রেণীস্বার্থমগ্ন স্থবির জীবনের প্রতি অভিজাতের

মমতা লক্ষ্য করে কবি তিরস্কার প্রকাশ করেছেন। শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের, পার্শ্ববতী সাধারণ মানুষের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষা ও আরামপ্রবণতার গ্লানির দিক কবিচিত্তকে ব্যথিত ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। আগে থেকেই কবি গোঁড়া হিন্দুয়ানির ও মেকি স্বদেশীর বিরোধী ছিলেন, ক্রমে যে- কোনো স্বার্থ সংরক্ষণেরই বিরোধী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে কবিচিত্তে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার প্রবল উদ্বোধন ঘটে। কবি বাস্তবক্ষেত্রে বিভেদ ও সংকীর্ণতার মধ্যে জাতীয়তার কোনো আদর্শরূপ দেখতে না পেয়ে রোম্যাণ্টিক কল্পনার বশে সাময়িকভাবে প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্র ও বর্ণাশ্রম-বন্ধনের মধ্যেই যেন সত্য দেখতে পেলেন। প্রাচীন সাহিত্য এবং উপনিষদ কিছু কালের জন্য তাঁর চিত্তকে আবিষ্ট করে তুললে। 'যে জীবন ছিল তব তপোবনে/ যে জীবন ছিল তব রাজাসনে/ মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে/ চিত্ত ভরিয়া' – বরণ করার আগ্রহ তিনি প্রকাশ করতে লাগলেন এই সময়কার বেশ কিছু কবিতায়। একালে আধুনিক শিক্ষিতের কৃত্রিম সভ্যতার চেয়ে কল্পিত প্রাচীনের সরল জীবনধারাই তাঁর কাছে অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়েছে। নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছের এবং উপনিষদের রাজ্যে ভাবমূলক প্রয়াণও একালে। জাতির শিক্ষার মধ্য দিয়েও ঐরকম আদর্শের একটি স্থায়ী মূর্তি গড়ে তুলতে তাঁর আগ্রহ জাগল। কাল্পনিক তপোবন-জীবনকে শান্তিনিকেতনে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তিনি। ফলে কার্যক্ষেত্রে তিনি খানিকটা রক্ষণশীলও হয়ে পড়লেন। তবে এই প্রাচীনের সম্মোহ তাঁর চিত্তে আত্যন্তিক হয়ে রইল না। আশ্রম-বিদ্যালয়ে মন্ত্র, উপাসনা, বর্ণভেদরক্ষার পরীক্ষামূলক ব্যাপার কিছুদিন সোৎসাহে চলল বটে, কিন্তু চলিষ্ণুমনা কবি আন্তরিক যুক্তির উপর নির্ভর করে প্রাচীন অনুসরণের অসারতা বুঝলেন শীঘ্রমধ্যেই। তিনি ফিরলেন। হয়তো দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ কৃষকের মুখচ্ছবিই তাঁকে ফেরালে। এরই মধ্যে এল বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। কবি শৌখিন জীবনকে নিঃশেষে প্রত্যাখ্যান করে দুঃখ, কর্ম ও সংগ্রামের জীবনকে গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন। এল স্বদেশী, আর বইল তাঁর দেশপ্রীতির গানের স্রোত। কিন্তু ভাবপ্রবণ স্বাদেশিকতাতেও কবি স্থায়ী হতে পারলেন না, কারণ, দেখলেন দেশের মধ্যেই রয়েছে প্রকাণ্ড বিভেদ। অপ্রত্যাশিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা স্বাদেশিকতার অভ্যন্তরীণ ত্রুটির দিকে তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিলে। উল্লেখযোগ্য 'সুপ্রভাত' কবিতাটি (রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি-) এই দাঙ্গারই প্রতিঘাতে লেখা। কবি দেখলেন ভাবাবেগ-সম্বল আন্দোলনে কোনো ফল হবে না যদি হিন্দুমুসলমান না মেলে।

ঐ কবিতায় তিনি বললেন রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার এই রাহুগ্রাস শাপে বর হয়েছে। এবার চোখ খুলবে যে, নিম্নবর্ণ ও কিসাণ-হিন্দু কিসাণ-মুসলমানের উন্নয়নকার্য ছাড়া স্বাদেশিকতার অন্য পথ নেই- 'মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে'।

উক্ত কবিতায় তিনি জমিদার ও ধনী উচ্চবর্ণকে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ ত্যাগ করার আহ্বান জানাতে গিয়ে শোষিত অসহায় মানুষের ছবি তুলে ধরলেন-

"তোমার শ্মশান- কিংকরদল দীর্ঘ নিশায় ভুখারি।
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া উঠিছে ফুকারি ফুকারি-"

জমিদার ও জোতদারদের কাছে আবেদন জানালেন-

" অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ ' পরে

খোলো খোলো দ্বার, ওগো গৃহস্থ, থেকো না থেকো না লুকায়ে।"

কারো অপেক্ষায় না থেকে নিজেই আরম্ভ করলেন জমিদারী এলাকায় নির্দিষ্ট একটি প্রশাসনিক কাঠামোয় গ্রাম-উন্নয়ন গ্রাম-স্বরাজ প্রবর্তনের প্রয়াস। শিক্ষায় জন্য স্কুল, স্বাস্থের জন্য চিকিৎসক- উপদেষ্টা, ঋণমোচনের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সালিশী বিচার প্রভৃতি। এই ছিল তাঁর গঠনমূলক স্বাদেশিকতার পরিকল্পনা। শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলন অনায়াসেই ঘটবে এই ছিল তাঁর আশা। পরে চরকা, অসহযোগ প্রভৃতি আন্দোলনের মুখে তাঁকে বারংবার আক্ষেপ করতে শোনা গেছে যে স্বাদেশিকরা ঐ সংগঠনের পথে এলেন না।

যাই হোক, উপেক্ষিত পল্লীর ও অবহেলিত মানুষের উপর এই কার্যকর দৃষ্টিক্ষেপ তাঁকে প্রাচীনধর্মী কাব্যিক আদর্শপ্রবণতা থেকে সরিয়ে ক্রমে বাস্তবে নিয়ে এসেছে। খেয়া ও গীতাঞ্জলিতে তিনি নোতুন করে প্রত্যক্ষ গ্রামীণ নিসর্গের চিত্র রচনায় ফিরে এসেছেন। আর মানুষে মানুষে জাতিবর্ণগত শ্রেণীভেদের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ কামনা করছেন। গোরা উপন্যাসে ধর্মের সংকীর্ণতা ও আচারসর্বস্বতা যে নিতান্ত অসার বস্তু তা কবি দেখিয়েছেন। কিন্তু গীতাঞ্জলির মতো কাব্যেও, প্রকৃতি থেকে অরূপরহস্য অনুভবের মুহূর্তেও, কবি যে মেহনতী মানুষকে উচ্চে তুলে ধরেছেন (তিনি গেছেন যেথায় মাটি কেটে করছে চাষা চাষ –ইত্যাদি) এবং সামাজিক অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, এইটিই তাঁর মানবিকতা বিষয়ে বড় কথা। এই সময়কার 'অপমান' কবিতার মতো এত স্পষ্ট সমাজ বিষয়ে আবিষ্ট কবিতা একালে আর একটিও নেই, বহুপূর্বে ছিল একমাত্র- ' এবার ফিরাও মোরে'। দেখতে গেলে গীতাঞ্জলিতে কবিহিসাবে নিতান্ত সহজ হবার অবসরে মানবিক অসাম্যের জন্য তাঁর সহজবুদ্ধিপ্রসূত বেদনাবোধ আরো কয়েকটি গানেও

পরিস্‌ফুট। তবু হয়তো কবির এই প্রতিবাদ যেন অসহায়ের বিলাপ, মানুষ স্বহস্তে এই সামাজিক অসাম্য চূর্ণ করবে এমন উদ্দীপনা 'অপমান' কবিতায় এখনই দেখা না বলা যেতে পারে, কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে এই সংক্ষিপ্ত গীতিকাব্যিক অবসরে এর বেশি প্রত্যাশাও করা যায় না। কবিস্বপ্নজাত সেই প্রাচীন তপোবন-মহিমার রেশ কিন্তু গীতালিতে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। যেটুকু রয়েছে বিলাতযাত্রার পূর্ব-পত্রে তিনি তা চুকিয়ে দিয়ে গেলেন, এখানকার তুলনায় ইয়োরোপীয় জীবনধারায় মানবিক সাম্যের মহিমা স্মরণ করে।

এদেশে সামন্ততান্ত্রিক শাস্ত্র ও প্রথার সহায়তায় দীর্ঘকাল ধরে যে মানুষ –নির্যাতন চলছে, কবিচিত্তে তার দাহ কিন্তু 'অপমান' কবিতা লেখাতেই শেষ হল না। লিখলেন 'অচলায়তন' নাটক। অনুন্নত নিম্নবর্ণের প্রতি কবির সহানুভূতি কী গভীর তার পরিচায়ক এই নাটকটি। আর লক্ষণীয় এই যে, রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কবি এই সমস্যার সমাধান চাইলেন। 'শোণপাংশু ' নিম্নবর্ণের সহায়তায় আর্যামির অচলায়তন চুরমার করে সংগ্রামের নায়ক সাবধান করে দিয়েছেন, অচলায়তনের ভিত পুনরায় গাঁথবার চেষ্টা করা হলে তিনি আবার ভাঙবেন। নাটকটি রক্ষণশীলদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গে বিচ্ছুরিত। আর এটি প্রকাশিত হলে কবি রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকায় যে-ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাতেই এটির রচনার সার্থকতারই প্রমাণ মিলে। দেখা যায়, দেশের এই পরিস্থিতি বৈদেশিক পরাধীনতা থেকেও কবির কাছে গুরুতর বলে মনে হয়েছে। কালান্তরের একটি প্রবন্ধে বলেছেন, মানুষ-পেষাই-করা, আবহমান কাল থেকে স্থির, শাস্ত্রে প্রথায় নিরেট নিশ্ছিদ্র করে গড়া এই জাঁতাকল কি ইয়োরোপের যান্ত্রিকতা থেকে কোনো অংশে খাটো?

কবির ইয়োরোপ থেকে ফেরার কিছু পরই এসে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ, যা তাঁর নিসর্গস্বপ্ন ও প্রাচীন জীবনের প্রতি কিছুকালের মোহের উপর তীব্র অভিঘাতের সঞ্চার করলে। আর, এখন থেকে তাঁর কাব্য বিশুদ্ধ নিসর্গকে ও সাধারণ মানবপ্রীতিকে সরিয়ে ফেলে প্রত্যক্ষ মানুষ ও সমাজকে স্থান করে দিলে। গতি, পরিবর্তন, সংঘাত ও বিজয়ের আশ্বাসে মুখর চলমান মানবসমাজ তাঁর সমস্ত মনোযোগ এখন থেকে আকর্ষণ করলে। তাঁর কাব্যে নাট্যে এখন থেকেই যথার্থ পালাবদল শুরু হয়েছে আর এই সংগ্রামী অধ্যায় স্বাভাবিক পরিণাম লাভ করেছে দীনহীন মানুষের জন্য ব্যথিত উদ্বেগে।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় লেখা হল গীতালির গান ও বলাকার কবিতা। প্রথমের দিকে কবি নিজজীবনে দুঃখ বরণের উৎসাহ অনুভব করেছেন, পরে জাতির জীবনে সংগ্রামী মনোভাবের, মরণভয় ত্যাগ করে নোতুন জীবনকে স্বীকার

করার প্রেরণা বিস্তার করেছেন। বলাকার 'পাড়ি' (মত্তসাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে-) কবিতাটি মহাযুদ্ধ আরম্ভের মাত্র কয়েকদিন পরে লেখা। ফলে তিনি এই যুদ্ধকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখছেন তার পরিচয় এর মধ্যে সহজ ও স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, কবি ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানবজীবনে ক্রিয়াশীল শক্তিকে মহাকাল, ইতিহাস-বিধাতা, পথের পথিক, খেয়ার নাবিক প্রভৃতিরূপে কল্পনা করেছেন। পূর্বেকার গীতাঞ্জলি প্রভৃতির মধ্যে কবি নিসর্গের সৌন্দর্যের অথবা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে এই সত্তার আগমন কল্পনা করেছিলেন। এই সত্তা কবির রহস্যময় কল্পসত্তা, ঠিক আমাদের বহুপরিচিত ঈশ্বর নয়। 'পাড়ি' কবিতায় এঁকে দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অভিযাত্রী নাবিক অর্থাৎ মানব-ইতিহাসের নায়ক হিসাবে কল্পনা করে বললেন- মানবসমাজের আপাত দুর্যোগ–দুঃখের মধ্য দিয়েই এই ইতিহাস-বিধাতার অনিবার্য সঞ্চরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। মহাযুদ্ধের মাধ্যমে তিনি একেবারে আমাদের সামনে এসে পড়েছেন। ঝড়ের মধ্যে ঐ তাঁর তরী দেখা যাচ্ছে, তুফানের উপর অনায়াসে পাড়ি জমিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি আসছেন কী জন্য? এর উত্তরে কবিই জানাচ্ছেন- মানুষ বহুদিন ধরে লাঞ্ছিত হচ্ছে, উৎপীড়িতের দুঃখ তার সীমা অতিক্রম করেছে, তাই মুক্তির আশ্বাস নিয়েই তিনি এসেছেন-

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।

বিশ্বের কাছে এইসব বঞ্চিতের কোনো পরিচয় নেই, নাম নেই। পথের পাশে পড়ে-থাকা এইসব মানুষের দূরবস্থার প্রতীকী চিত্রও কবি দিয়েছেন-

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি

আশাবাদী কবি ধরেই নিয়েছিলেন যে, এবার একটা ওলট-পালট হবে নিশ্চয়ই, সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্র হটবে এবং মানুষের মুক্তি আসবে। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণে কবি মহাযুদ্ধকে ঐ কারণে অভ্যর্থনাও করেছেন দেখা যায়- "ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে। সেইখানে তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙ্‌তে হয়। তবে মিক্তি। ..... এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে।"

রবীন্দ্রনাথ এরকম বহু ভাষণের মধ্যদিয়ে ("শান্তিনিকেতন" দ্রষ্টব্য) কেবল এই বিশেষ যুদ্ধকেই নয়, প্রকারান্তরে সমাজ বিপ্লবকেও সমর্থন জানিয়েছেন। মহাযুদ্ধকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে স্বদেশের মানুষ-নির্যাতনের প্রসঙ্গে কবি এসেছেন এবং তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই বিভেদের বৈপ্লবিক সমাধানের জন্য দেশবাসীকে উৎসাহিত করেছেন-

> "রুদ্ধ সত্যের করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়েনি। সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি। অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন, বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে, সেই প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে। ..... আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে তুলেছি। ..... ইতিহাস-বিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না! মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতি প্রতিহত করবে সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না? "

কবি নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে –বিপ্লবের কথা বলছেন তার মধ্যে ভাগ্যবিধাতার প্রসঙ্গ তুললেও একথা তো অস্পষ্ট থাকছে না যে মানুষের মধ্য দিয়েই সে প্রেরণা কার্যকরী হবে। বস্তুত কবি স্বকীয় ভাবে ইতিহাস-বিধাতার সত্তায় বিশ্বাসী। তাই তিনি এইভাবেই কথা বলেছেন।

বলাকায় কবিতানিচয়ের সংগ্রামী জীবনকে অভিনন্দন, দুঃখপথের যাত্রী মানুষের জীবনের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত, সেজন্য এ নিয়ে আমরা কালক্ষেপ করতে চাই না। কিন্তু পরবর্তী 'মহুয়া' কাব্যের মুখ্য কবিতাগুলির সম্বন্ধে দু-চার কথা না বললেই নয়। 'মহুয়া' একালের প্রেম-কবিতার সংকলন। কিন্তু এ প্রেম নিতান্ত বিশিষ্ট, অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়করভাবে নোতুন। বিলাসী জীবনের সুপরিচিত এবং আমাদের বহু –অভিলষিত সেই পুরাতন সংকীর্ণ গোপন প্রণয় এ নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ধূলি- ধূসরিত অথচ সেইভাবে মহিমান্বিত একটি নোতুন রূপ দেখিয়ে চির-আধুনিক কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, বলাকায় উপলব্ধ কবির বৈপ্লবিক জীবনবোধই মহুয়ার প্রেমকে বৈপ্লবিক নোতুনত্ব দিয়েছে। মহুয়ার প্রণয়িনী প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে। আর চিরাচরিত গোপন মিলন-বিলাস ত্যাগ করে দুর্গম দুঃখের পথে প্রেমিকের সঙ্গে চলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন-যাব না বাসর কক্ষে ..... বাজায়ে

কিঙ্কিণী/ আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী। উভয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে- আমার দু'জনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে/ মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে/ পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে/ বাসররাত্রি রচিত না মোরা প্রিয়ে। মহুয়ার বসন্ত প্রাচীন সঞ্চিত সংস্কারকে ধিক্কার দিয়ে পুরাতনকে ভাঙ্‌বার মন্ত্র নিয়ে ('আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে') প্রেমিকের সামনে সমুপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু মহাযুদ্ধের অভিঘাতে কবির দৃষ্টি কেবল ভাবজগতে নিলীন রইল না, বাস্তবের ধূলা-মাটিও প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করলে। কবি নিপীড়িত জনতা, বিশেষে মেহনতী মানুষের দিকে আকৃষ্ট হলেন। পিছনের পটভূমিতে রইল নিসর্গ, সামনে এগিয়ে এল মানুষ- অর্ধাশিত কঙ্কালসার মাটির কাছের মানুষ। আঁকলেন রাষ্ট্রিক অত্যাচারের ছবি- মুক্তধারা, আর ধনতান্ত্রিক শোষণের একটি বেদনাকরুণ দলিল তৈরি করলেন- রক্তকরবী। আধুনিক রাষ্ট্র যন্ত্রবিজ্ঞানের সহায়তায় শক্তিমান হয়ে অধিকৃত দেশে পণ্যের হাট বসাচ্ছে, যন্ত্রশক্তিহীন মানুষকে দাসত্বে বদ্ধ করছে। বিগত যুদ্ধে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কুটকৌশলী মানুষ- নির্যাতনের স্বরূপপুষ্ট মুক্তধারায় এই জঘন্য অসভ্যতার আভাসমাত্র কবি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পিছনে রয়েছেন ধনতান্ত্রিক প্রয়োজন ('লড়াইয়ের মূল'- কালান্তর), আবার তারও পিছনে রয়েছে একটা জঘন্য প্রবৃত্তি-লোভ। ধনতান্ত্রিকতার নির্লজ্জ স্বভাব দেখে এবং মানুষনিপীড়ন দেখে কবি উপলব্ধি করেছিলেন, নিজকৃত জটিল জালে আবদ্ধ হয়ে এ পাপটা আত্মহনন করবে, আবার শ্রমিক-বিপ্লবও সেই অপমৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। আমরা রক্তকরবীর কথা বলছি। এ নাটকে সাংকেতিকতা থাকলেও কারখানার বাস্তব পরিস্থিতির চিত্রেরও কিছুমাত্র অভাব নেই। সব থেকে উল্লেখযোগ্য যন্ত্রসংস্কারে বিমূঢ় শ্রমিকদের মানসিক অবস্থার চিত্র। তারা পুনঃপুন পৌষের ফসলের ও মাটির ডাক শুনেও সাড়া দিচ্ছে না, বরং প্রতিরোধের আয়োজন করছে। কিন্তু অবশেষে বহু সংঘাতের পর অধিকাংশের চৈতন্য জাগল, তারা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহই করলে। এরই সঙ্গে কবি দেখালেন মিলের মালিকও স্বর্ণজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে পরিশেষে জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে মেহনতী মানুষের মুক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। রক্তকরবীর এই অংশটুকুতেই কবির কল্পনা ও আদর্শবাদ। মালিক তার কারখানা নিজে ভেঙে ফেলছে এর ইতিহাসের নজির কবি রবার্ট ওয়েনের দৃষ্টান্ত থেকে পেয়েছিলেন হয়তো বা। তবু এর মধ্যে কবিসুলভ ভাবাদর্শও রয়েছে যথেষ্ট। আর এটুকু না থাকলে রক্তকরবী শ্রেণী- সংঘর্ষের বাস্তব নাটকই হয়ে পড়ত। রক্তকরবীতে যা ধ্বংসের মধ্যে প্রতীয়মান এবং সমস্যা হিসাবে যার এলাকা বিশ্বব্যাপী, তারই স্বাদেশিক ও গঠনমূলক রূপ কবি দেখালেন রথের রশি বা 'কালের যাত্রা' নাটিকার স্বল্প পরিসরে। দেখালেন এ দেশের নিম্নবর্ণ, যারা মেহনতীও, তারা রাষ্ট্রের সহযোগী না হলে রাষ্ট্রের রথ অচল হয়ে পড়বে। ব্যঞ্জনা

এই যে- অতএব এদের উন্নয়ন অর্থাৎ শিক্ষিত বিত্তবান সমাজের সামিল করে নেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়টি কবি সমাজনেতাদের প্রতি তাঁর শেষ অনুরোধের মর্মে একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন, যার কথা একটু পরেই বলছি। কিন্তু রক্তকরবী ও কালের যাত্রা পড়ার পর রবীন্দ্র-রচনার পাঠকের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে এই রবীন্দ্রনাথ অন্য রবীন্দ্রনাথ নন, একই রবীন্দ্রনাথ , ক্রমশ অনুভূতি ও উপলব্ধির পরিণামে এসেছেন।

কবির রচনার লেখচিত্রের এই দ্বিতীয়ার্ধে, মানবমুখ্যতার অংশে , কাব্যকবিতার রীতিবদল ও সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর বদলও লক্ষণীয়। 'পুনশ্চ' কাব্যে কবির এই বৈপ্লবিক পথ- পরিবর্তনের বিষয় অনেক পাঠকই জানেন। তাঁর অবলম্বিত নোতুন বাহন গদাচ্ছন্দ তখনকার কাগজপত্রে কী বিতর্কেরই না সৃষ্টি করেছিল। তার উপর অতি নগণ্য মানবিক বিষয়ের পরিস্ফুটনে কবির আগ্রহ- নেড়িকুত্তার সহচর ইস্কুল-পালানো সেই দুরন্ত ছেলেটা খোঁপায় ক্যামেলিয়া-গোঁজা সেই সাঁওতাল রমণী; কিনু গোয়ালার গলির পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানী, আর কোপাই-তীরের মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু, ছেঁড়া ছাতি মাথায়! দ্বিতীয় পালাবদলের হাওয়ায় কবির যেন হাড়েমাসে রূপান্তর ঘটল, কবি স্বপ্নচারীতায় আর পরিতুষ্ট থাকতেই চাইলেন না। 'পুনশ্চ'র অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কয়েকটি কবিতা এবং একই সঙ্গে চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ নাট্যগ্রন্থনও লক্ষণীয়। 'তাসের দেশ' পূর্বোক্ত অচলায়তনেরই সূক্ষ্ম প্রতিরূপ, দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের উপর আরও পরিশীলিত ব্যঙ্গে দীপ্তিমান। আর এই নাটো সংযোজিত সমাপ্তি- সংগীতের একটি বাণী চিরকালের মত অক্ষয় হয়ে কবির বিপ্লবী মহিমা কীর্তন করছে- জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্। কবি এই সময়ে শ্রীনিকেতনে অবহেলিত মানুষের উন্নয়নের কাজে নিমগ্ন, উত্তুঙ্গ ভাবস্বপ্নের বিকার সযত্নে পরিহার করারই প্রয়াস করছেন।

শ্রীনিকেতনীয় মানুষ-উন্নয়ন প্রসঙ্গে তাঁর 'পল্লীপ্রকৃতি' পুস্তিকায় নিবদ্ধ ভাষণাবলী মিলিয়ে নেওয়া কর্তব্য। এ বিষয়টি বুঝে দেখতে হবে যে তাঁর কাব্যগত মানব-অনুরাগ ছন্দোবিলাসবিভ্রম মাত্র ছিল না, তার ভিত্তি কার্যকরী, সুদৃঢ় ও সামগ্রিক আত্মনিয়োগে। চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা ও কর্মের এহেন সামঞ্জস্য দূর্লভ। ' সমবায়ে'র ভাষণগুলিতে স্বদেশের সামাজিক ও আর্থিক অসামঞ্জস্যের নিরাকরণ হিসাবে, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের কতকটা বিকল্প হিসাবে, কবি বহু পূর্ব থেকেই সমবায় ব্যবস্থায় প্রয়োগ বিহিত করে এসেছেন। আর পল্লীবিষয়ক ভাষণবলীতেও সংগঠনের পথ দেখিয়েছেন- যে গঠনমূলক স্বাদেশিকতার বিষয়ে তিনি শিলাইদহে- কালিগ্রামে বহুপূর্বই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ-বিপ্লবের বাণী গদ্য রচনাগুলিতে তেমন ব্যক্ত করেন নি, যেমন করেছেন কাব্যে নাটো সংগীতে- 'বাঁধ ভেঙে দাও- 'প্রভৃতি যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাই হোক, এও দেখতে হবে যে আমাদের স্বদেশের মানবিক সমস্যা পশ্চিমের দেশগুলি থেকে ভিন্ন, বরং

জটিলতর, কারণ আধুনিক ধনতান্ত্রিক শোষণের বহুপূর্ব থেকেই জাতিবর্ণ বিভাগময় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এর মজ্জার মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। কবির মানুষপ্রীতি কত আন্তরিক ও গভীর এবং আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কেও কবি কী পরিমাণ ওয়াকিবহাল, এমনকি খ্যাতনামা স্বাদেশিকদেরও অগ্রবর্তী, আর নীচের তলার মানুষগুলির উপর তাঁর কী গভীর অনুরাগ! 'পল্লীপ্রকৃতির' এক জায়গায় তিনি বলছেন-

> "দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রকাশ করেছে। ছোটলোকদের পক্ষে সকলপ্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছু দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল। অথচ দেশের অধিকাংশই তারা।"

'উপেক্ষিতা পল্লী' কবির একটি বিশিষ্ট ভাষণ। এর মধ্যে তিনি আধুনিক বিশ্বের শ্রেণী-পার্থক্যের বিবরণ দিয়েছেন-

> " বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর-এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে। চাঁদের যেমন একপিঠে অন্ধকার, অন্যপিঠে আলো, এ সেই রকম।"

পরে স্বদেশে এই অমানবিক ব্যবধানের জটিলতর গঠন বিশ্লেষণ করে শিক্ষিত শোষকদের অবহিত করতে গিয়ে ভাবী বিপ্লবের আভাস সূচনা করে বলছেন-

> "এইধারেই সব কিছু থাকে, আর এক-ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ..... এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে, তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে- কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে।"

এর কিছু পূর্বে কবি কারো কারো অনুরোধ উপেক্ষা করেই রাশিয়া পরিভ্রমণ করে এসেছেন, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের দেশ-উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ লক্ষ্য করেছেন, আর স্বদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বার্থময় ঔদাসীন্য অনুভব করে বিলাপ করেছেন- কী হয়নি, আর কী হতে পারত! 'রাশিয়ার চিঠি'র বিষয় সকলেরই জানা। এ নিয়ে কালক্ষেপ কর্তব্য হবে না। আমরা তাঁর একান্ত প্রগতিমুখী চিন্তাভাবনার ও কার্যকলাপের সঙ্গে একালকার এবং একেবারে শেষ দিককার কবিতার সম্বন্ধ দেখিয়ে উপসংহারে আসছি।

কাব্যগ্রন্থের নাম 'পুনশ্চ'। কবিতার নাম- প্রথম পূজা। আমরা দেখেও দেখিনি, অথচ কবি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে মধ্যযুগে রাজা জমিদারেরা যেসব উৎসব অনুষ্ঠান করে জনচিত্ত তৃপ্ত ও বশীভূত রাখতেন, এই সেদিনও যার রেশ ছিল এবং আজ যা বারোয়ারিতে পরিণত হয়েছে, সে-সব ঠাকুর-দেবতা অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণ বা অনার্যদের কাছ থেকে দখল-করা, কেড়ে নিয়ে আসা। এরকম রাজন্য-প্রতিষ্ঠিত একটি দেবতার মন্দির বা 'রাজদম্ভের মন্দির' একদিন ভাঙল ভূমিকম্পে, সারাবার জন্য নিরুপায় হয়ে রাজাকে ডাক দিতে হল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কারিগর কিরাতবৃদ্ধকে, পূর্বে যার সম্প্রদায়ের প্রাণের ঠাকুর ছিল এই দেবতা। রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসারে অন্ত্যজ কিরাতের দেবতার দিকে তাকানো নিষেধ, তাই তার চোখ বেঁধে দেওয়া হল। মন্দির সারাবার কাজ যখন সমাপ্ত তখন বৃদ্ধ কারিগর আর থাকতে পারলে না, চোখের বাঁধন খুলে আকণ্ঠ পান করতে লাগল নিজের দেবতার রূপকে। খবর গেল। রাজা এসে স্বহস্তে তার শিরশ্ছেদ করলেন। গদ্যচ্ছন্দে লেখা কবির এটি একটি উৎকৃষ্ট কবিতা, ভাবে ভাষায় বৈপ্লবিক ব্যঞ্জনায়।

কাব্যগ্রন্থ 'পত্রপুট', কবিতাটি কবির আত্মচরিত্র বর্ণন বিষয়ে। এতে কবি উদাত্তভাবে শ্রেণীজাতির বিভাগমুক্ত বাউলের সঙ্গে নিজের সগোত্রতা- সম্পর্ক বুঝিয়ে দিয়েছেন-

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত .....
কবি আমি ওদের দলে-
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।

এবং একটা আদর্শের পথিক হিসাবে তিনি যে-সত্তার পূজারী তাকে অন্তরতম মানুষ আখ্যা দিয়ে অনুনয় করেছেন-

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা

সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।

পত্রপুটের 'আফ্রিকা' কবিতা এই নিপীড়িত মানবমর্মেই রচিত। তবে লক্ষণীয় এই যে, রাষ্ট্রনেতা ও শাসক বাদ দিয়ে ইয়োরোপের জনসাধারণের উপরে কবির যে সামান্য আস্থা ছিল তাও এক্ষেত্রে স্তিমিত হয়ে গেছে। কবি দেখেছেন, ওপারে যখন বীভৎস হত্যালীলা চলেছে, তখন এপারে তাদের মন্দিরে বাজছে ঘণ্টা, তারা খ্রীস্টের কাছে জয়ের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে। পশ্চিমের সভ্য জীবনের উপর প্রচণ্ড ধিক্কার ও ঘৃণার কবিতা এটি।

শেষ জীবনে কবি তাঁর নিজ স্বরূপকে নিঃশেষে পরিচায়িত করতে ব্যগ্র হয়েছিলেন, কারণ, তিনি দেখেছিলেন তাঁকে কেবল নিসর্গ-প্রেমিক ও উপনিষদবাদী কবি বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই শেষবেলায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে মানহারা ভাষাহারা কর্মী মানুষের সঙ্গে আত্মিক দৌহার্দ্য, অথচ বহিরঙ্গে বঞ্চিত থাকার বেদনার বিষয়ও কবিকে বারবার জানাতে হয়েছে-

সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

এই কবিতারই অনুপূরক হিসাবে মৃত্যুর মাসছয়েক আগে লেখা বিখ্যাত কবিতা হল 'ঐকতান'- প্রায় সর্বজনপরিচিত। এই কবিতায় তিনি আরও স্পষ্টভাবে মেহনতী মানুষের সঙ্গে তাঁর নিকট অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভাবের কথা জানিয়ে ঐ মূঢ় সম্প্রদায় থেকেই উঠে আসা কোনো কবির আগমন কামনা করেছেন। কবি তাঁর নিজের দৈন্য জানিয়েছেন, সেকথা ঠিক, কিন্তু অবহেলিত শোষিত মানুষকে প্রত্যক্ষ দেখে তাদের দূরবস্থার পরিচয় জেনে এত অশ্রুপাত, ক্ষতি-স্বীকার এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্‌যোগই বা আর কোন্ সাহিত্যিক করেছেন?

কবির প্রয়াণের বৎসরে মানবিক-অধিকার –শূন্য মানুষের সপক্ষতা বিষয়ে লেখা আরও অন্তত দুটি কবিতা স্মরণীয়। প্রথমটি রয়েছে 'আরোগ্য' কাব্যে, দ্বিতীয়টি পরবর্তী কাব্য 'জন্মদিনের' মধ্যে। এসব উক্ত 'ঐকতান' কবিতারই কাছাকাছি সময়ে লেখা। এর প্রথমটিতে (ওরা কাজ করে) কবি রাষ্ট্রিক প্রতাপ, জটিল শাসন-ব্যবস্থা ও শাসক ব্যক্তিদের ক্ষণস্থায়ী ও মূল্যহীন মনে করেছেন। অপরপক্ষে, অভিনন্দিত করেছেন মেহনতী সাধারণ মানুষকে, চিরকালের সত্য মানুষ বলে। কারণ, এরাই মানুষের বাঁচার আয়োজন ও সভ্যতার ভিত তৈরি করে সৃষ্টিকে সার্থক করে চলেছে চিরকাল। সাধারণ মানুষের মমত্বে উদ্‌বোধিত হয়ে লেখা কবির শেষ কবিতা হল- 'সিংহাসনতলচ্ছায়ে-'। বর্ণনায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের কী বিগলিত করুণা, কী অপরিসীম স্নেহ! অথচ কবিতাটি রাষ্ট্রনেতাদের ও

সমাজশাসনদের প্রতি অনুজ্ঞাবাহীও বটে। ইংরেজ শাসনের অবসরে লেখা হলেও এটি কালোত্তীর্ণতার মহিমাও বহন করছে। শোষিত মানুষের বাস্তব চিত্র নিরলংকার স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করে কবি রাষ্ট্র-সমাজ-নেতাদের সমাধান করে দিয়েছেন, মানুষে-মানুষে নিদারুণ পার্থক্যের অবসান না ঘটালে রাজত্ব বিপ্লবের আঘাতে বিচূর্ণ হবে-

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজা জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা। .....
মহাঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত-
সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়। ইত্যাদি

নিত্য এই দাহ অন্তরে বহন করে কবি যে শান্তিতে প্রয়াণ করেন নি এ আমরা জানি।

একটি কবিতার একক কবি

মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা
তাহাদের বাণী যেন শুনি।
(ঐকতান কবিতা)

কবি নিজেই তা শুনিয়েছেন, কিন্তু আমরা কান দিই নি। অন্তত তার সাক্ষ্য আমাদেরই নির্মিত আজকের ভারত-রাষ্ট্র দেয় না।

নিরক্ষর, অর্ধাশিত ও জাতিবর্ণের শাস্ত্রকৌশলে লাঞ্ছিত মেহনতী মানুষের প্রতি কবির মমতার পরিচয় 'চৈতালি' কাব্যে, 'ছিন্নপত্রে' গীতাঞ্জলিতে, অচলায়তনে এবং শেষজীবনের বেশ কিছু কবিতা ও নিবন্ধে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যে-কবিতাটি ধরে আজ কবিস্মরণ করা হচ্ছে তার পটভূমির বিশেষত্ব রয়েছে। কবিতাটির নাম 'সাঁওতাল মেয়ে'- কবির চুয়াত্তর বছর বয়সে লেখা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস নামে কিছু লেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তার তেমন পরিচয় উক্ত ইতিহাসের বইগুলি থেকে কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষে এ রহস্য আজও উন্মোচিত হয় নি যে পাঁচ-ছ হাজার বছর আগে উত্তর ভারতের বিপুল সংখ্যার কোল- মুণ্ডা মানুষ মুষ্টিমেয় আর্যদের কাছে কেন ও কিভাবে নিঃশেষে আত্মদান করে দাসত্ব বরণ করলে। আজকের দিনেও অরণ্য-পর্বতে যেসব আদিবাসী সভ্যতা- সংস্রব প্রায় পরিহার করেই কাল কাটাচ্ছেন তাঁদের মানসিকতার উপাদান বিচারে আগেকার দিনের তাঁদের সেই উদাসীনতা বা সহজবশ্যতার কোনো সমর্থন পাওয়া যায় কি না। যাই হোক, একটা সঠিক সত্য এই যে, শাস্ত্র প্রথা আচার নিয়ে যে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি চলছে তার অনেকটাই দ্রাবিড়-অস্ট্রিক উপাদান দিয়ে গড়া। পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দুদের সামাজিক রীতি-নীতি পাল- পার্বণ আচার-অনুষ্ঠান এমন কি ভাষাভঙ্গিতেও কোল বা সাঁওতালদের অবদান যথেষ্ট রয়েছে। এরা নিজেদের ভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে, কিন্তু নিগ্রহের পরিবর্তে উল্টে দানই করেছে অনেক কিছু। এরা নৈসর্গিক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রামী অথচ অতিপ্রাকৃত বা দৈব নিয়ে অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। কর্তব্যপরায়ণ

কর্মযোগী অথচ সৌন্দর্যে গানে আত্মপ্রকাশের আনন্দে নিতান্ত ব্যাকুল। ক্ষুধার তাড়নায় বহুদিন ধরে তাদেরই মিশ্রিত সংস্করণ হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য দিক্‌কুদের সেবায় এরা শ্রমদান করে আসছে। অর্থে প্রভুত্বে অপকৌশলে বলশালীদের জন্য অরণ্য সাফ্‌ করে জমি তৈরি করে দিচ্ছে, গৃহ নির্মাণ করছে, আরণ্য ফল ও কাষ্ঠভার সমাহরণ করে আনছে। ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে যেতে নিতান্ত অনভ্যস্ত এই নিঃসম্বল মানুষগুলি ক্রমাগত ধড়িবাজ মহাজনদের ও সুবিধালোভী 'দিক্‌কু' অর্থাৎ 'পীড়াদায়ক' বর্ণহিন্দুদের শোষণে জর্জরিত হয়েই এসেছে। এদের মানসিকতা নিয়ে ইতিহাসের পণ্ডিতেরাও গবেষণা করেন নি, আর আমরাও সামান্য মানবিক সহানুভূতি নিয়ে তাকাই নি এদের দিকে, ইংরেজ মিশনারি ও আমলাদের কেউ কেউ সাঁওতালদের বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেও। এর ব্যতিক্রমও হয়ত রয়েছে। জৈন ও বৌদ্ধেরা ধর্মপ্রচারের জন্য ঝাড়খণ্ডে এসে উন্নয়নে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন জানা যায় না, আর বৃন্দাবন যাতায়াতে শ্রীচৈতন্য ঝাড়খণ্ডের পথ বেছে নিয়ে হয়ত বা এই আদিম মানুষগুলির স্পর্শলাভের জন্যই ব্যাকুলতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু একেবারে আধুনিকে যাঁরা এদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে দুই মহৎ ব্যক্তি রয়েছেন, রয়েছেন সাম্প্রতিক দু-চার জন লেখক-লেখিকা। কিন্তু রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া কোনো সহানুভূতিই তো আর সক্রিয় হতে পারে না। আর বর্তমান ভারত-রাষ্ট্র যেভাবে খোলাখুলি বণিক-রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে তাতে আর্ত ভালো মানুষের উচ্ছেদ-সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছে, উন্নয়নের প্রসঙ্গ বহু দূরে। কিন্তু থাক সে দুঃখের কথা।

কবিমর্ম থেকে আন্তরিকভাবে উৎসারিত 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতাটি আধুনিক মহাকবির সাঁওতাল- জীবন-প্রীতি ও সেই সঙ্গে মানবিক মমত্ববোধের অনন্য একটি নিদর্শন । শান্তিনিকেতনে বাড়ী তৈরি হবে, তাই সাঁওতাল মজুর কাটছে মাটি, সাঁওতাল নারী মাথায় মাটির ঝুড়ি নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে যাতায়াত করছে। বিরাম-বিশ্রামের ফুরসত নেই, বোধ হয় ইচ্ছেও নেই। কবির লেখনীতে রূপ নিয়ে যেমন এই নারী অমরতা পেয়েছে, তেমনি উন্মোচিত হয়েছে বিত্তবানের নগ্ন নিষ্ঠুর শোষকমূর্তি। বিমুগ্ধ অথচ বিবেকী কবি এই কাজে-খাটানো নারী-প্রতিমাটির স্বভাব-রূপে আকৃষ্ট হয়েই তাকিয়েছেন অন্তরের দিকে, আর কবিতাটি সমাপ্ত করেছেন আত্ম-ধিক্কারে। প্রারম্ভেই দেখা যাচ্ছে এই সাঁওতাল রমণীর উপর কবির যে মমতা তা আমরা যাকে বলি কবি-সহানুভূতি তার বহু উপরের বা গভীরের ব্যাপার। চমৎকারভাবে বাস্তব একটি রূপ এবং কল্পনা থেকে আহরিত আশ্চর্য একটি সাদৃশ্যের ইমেজ কবির এই মমত্বময় বিমুগ্ধতাকে পরিস্‌ফুট করেছে। আঁটসাঁট, কাজের বেশে লঘুগতি কৃষ্ণঙ্গীকে কবি চঞ্চল্য কালো পাখীর সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেছেন, আর তার গায়ের রঙ্‌ দেহের তনুতা ও চঞ্চল গতির সমন্বয় বাস্তবে

কোথাও না পেয়ে শ্রাবণের মেঘ ও বিদ্যুতের মধ্যে উপমানের সন্ধান করেছেন। দেখেছেন এ পাখী বিধাতার একেবারে হাতে গড়া সৃষ্টি-

বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন্ কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।

কবির বর্ণনা এইভাবে আলংকারিক সৌন্দর্যময় হলেও তা এতই কৌশলহীন অনায়াস যে প্রতি ছত্রে এমনকি শব্দেও কবির প্রিয়তা ও আন্তরিকতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গতিচ্ছন্দে আন্দোলিত ওর আঁচল-প্রান্তের লাল রেখা উদাসীন আকাশের বুকে পলাশের আভাস ছুঁয়ে দিচ্ছে। ওর 'লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া'। মুহূর্তে কবি সাঁওতালীর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন।

এর পরেই কবি মনোযোগ দিয়েছেন নিসর্গ-পরিবেশে, যে পরিবেশ এই মানবী মূর্তিকে আশ্চর্য সুন্দর করেছে এবং নিবিড়ভাবে ধরেও রেখেছে। শান্তিনিকেতনে শীতের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যাহ্ন। হিম-ঝুরি গাছ কচি পাতা প্রকাশের জন্য ব্যগ্র, আমলকী শাখায় ক্বচিৎ দক্ষিণার আমন্ত্রণ, মাথায় উপরে আকাশে পাক খাচ্ছে চিল, আর মাটিতে এই মানুষ-পাখী – ক্ষিপ্র, ঋজু অথচ মাথায় মাটি-ভর্তি ঝুড়ি। কবির করুণা-দৃষ্টি কেবল মাটিকেই সোনা করে নি, সেই মাটির মধ্যে লুকানো রয়েছে যে আশ্চর্য মানুষের মন, যা স্নেহে সেবায় বিগলিত, সুখে দুঃখে অকাতরে সহনশীল এবং প্রয়োজনে আত্মশাসনে প্রস্তুত – তাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখানোতেই কবির সেই অসামান্য শক্তির প্রকাশ হয়েছে যে-বিষয়ে আগের দিনের এক নারীকবি সঠিকভাবেই বলেছেন- ' তাঁর চক্ষু অচক্ষুরে করে চক্ষুষ্মান'।

উপসংহারে মহাকারুণিক এবং সেই সঙ্গে সমাজদ্রষ্টা কবি তাঁর নিজের স্বর্থলিপ্সু নগ্ন শোষকের ভূমিকা ধরে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথ না হয়ে সাধারণ কবি হলে এতদূর করুণা ও সমাজবোধের সত্যতায় আসতে পারতেন বা সাহসী হতেন এমন মনে করা যায় না। কারণ, আমরা সাম্প্রতিক বহু কবিকেই তো দেখছি। কবিতাটির তৃতীয় পর্যায়ে কবি বহিরঙ্গ মজুরনীর অন্তরের মানবীকে দেখলেন, দেখলেন নিজ সংসারে তার মহিমান্বিত সিংহাসন- প্রেমে স্নেহে শুশ্রূষায় প্রেরণায় আত্মনিবেদনে। সেখানে সে অমিত শক্তির অধিকারিণী। আর, অর্থে প্রভুত্বে সমাজের উপরের মানুষ আমি পয়সার বিনিময়ে তার মধ্যেকার সেই দেবতার শক্তি অপহরণ করছি গৃহনির্মাণের প্রয়োজনে। কবি বলছেন-

আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি-
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।

মানুষ রবীন্দ্রনাথের বিবেক ও করুণা তাঁর নিজের নগ্ন প্রয়োজনের দিক দেখানোর সঙ্গে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে অর্থের মালিকেরা জৈব স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে অহরহ কী অমানবিক কাজই না করে চলেছে। কবিতাটির উপসংহারে কবি সৌন্দর্য –রচনা সংরুদ্ধ করে সেই সব মানুষের প্রচ্ছন্ন মর্মবাণীকে স্পষ্ট ভাষারূপ দিলেন যারা দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে কোনোমতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও পারছে না, আর সেই সঙ্গে পরিস্ফুট করে তুললেন যুগে যুগে আর্থিক শক্তির সঞ্চয়ে প্রবল হয়ে ওঠা কিছু দানব কর্তৃক নিরক্ষর ও সরল মানুষকে শোষণ। কবি ভালোভাবেই জানেন বহু শতাব্দী আগে থেকেই জাতিবর্ণ- ভেদমূলক শাস্ত্রপ্রথার আশ্রয়ে ভারতে এই ছদ্ম মানুষ-শোষণ চলছে এবং চলবেও যতদিন না সবলে এর নিরাকরণ করা যায়। ফলে এই কবিতাটিতে ভাষিত সমাজসত্য বিশেষ দৃষ্টান্তে অতিক্রম করে সামান্যে গিয়েও পৌঁছাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কবিতাটি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করছে এই বিষয় যে যারা যুগ যুগ ধরে আরণ্য প্রতিবেশী, যাদের প্রস্তুত –জমি কৌশলে অপহরণ করে আমরা ভোগদখল করছি , পরিবর্তে তাদের সামান্য কিছুও ফিরিয়ে দিইনি শিক্ষাগত সভ্যতার দিকে চেয়েও।

কথায় কথা এসে পড়ে। আগন্তুক বিদেশীয় আর্যেরা যে দ্রাবিড়ভাষীদের কাছে বারংবার আহত হতেন রামায়ণ এবং ঋগ্বেদ তার একটা আভাস দেয়, কিন্তু শান্তিকামী নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির কোল-মুণ্ডাদের কাছে তেমন কোনো বাধা তাঁরা পান নি, হয়ত বা সহায়তাই পেয়েছিলেন, এদের স্বভাব-প্রকৃতি থেকেই তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঋগ্বেদ ও ঐতরেয় আরণ্যকের বিবরণে পাওয়া যায় পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ ভারত ধরে তখনও, অর্থাৎ দেড় হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দে অনার্যদের প্রবলতা ছিল। 'অত্যায়মায়ুঃ' টীকাকার সায়ণ ভুল ব্যাখ্যা সহকারে এদের সাপের জাত পাখীর জাত বলে বর্ণনা করে বলেছেন এরা ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞাদি না মেনে উচ্ছন্ন গিয়েছিল। কোলমুণ্ডাদের সহজ আর্যবশ্যতা ঠিক সেই সেই কারণে হতে পারে, যে –যে কারণে আমরা পাঠান-মোগল বা ইংরেজ কর্তৃত্ব নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলাম। দল-উপদল ও মতের পার্থক্য সহ সভ্য আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকার স্বভাব আদিম অনার্য রক্তধারায় পরিণাম কিনা তার বিচার নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের করণীয়। অঙ্গ-বঙ্গ-মগধের অস্ট্রিকদের মধ্যে যে শাখা বিমিশ্রিত আর্যদের কাছাকাছি এসেছিল তা হল সাঁওতাল-ভূমিজ। যুদ্ধের প্রয়োজনে তখনকার সামন্ত

রাষ্ট্রগুলি তীরন্দাজ সৈনিকরূপে যে এদের কাজে লাগাতো তার পরিচয় সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। বস্তুত এরা হিন্দুদের গ্রাম-নগরের কাছাকাছি এসেছে অনেকেই, অনেকেই বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে অন্ত্যজ হিসাবে বৃহত্তর হিন্দু মধ্যে স্থানও পেয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ন্যায়বিচার এবং অধিকার বলতে কিছুই এরা পায় নি। আজকের দিনের চাকরিতে সংরক্ষণ সত্ত্বেও উল্লেখ্য কিছু যে হচ্ছে না তার কারণ এদের শিক্ষার অভাব ও উচ্চবর্ণের ঘৃণিত স্বার্থবুদ্ধি। এদের সম্পর্কে বেদনার কথা রবীন্দ্রনাথ নানান্ ক্ষেত্রে নানা আকারে বলে গেছেন। আর শ্রীনিকেতন কেন্দ্র করে এদের উন্নয়নের জন্য তাঁর যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ তা সকলেরই জানা। সুতরাং 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতা তাঁর গভীর মর্মবেদনা থেকে উৎসারিত। সাম্প্রতিক কাব্যধারার মত আন্তরিকতাহীন নয় এবং সমাজমুখী মানবিকতার আজও শীর্ষে এমন বলা যেতে পারে।

সংগ্রামী জনজাগরণে কবির ভূমিকা

রবীন্দ্র-প্রয়াণের পঞ্চাশোত্তর কাল এবং স্বায়ত্ত-শাসন হাতে আসার দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পরও আমরা কবির অভিপ্রেত স্বাদেশিকতা তথা সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া-কলঙ্কশূন্য চরিত্রের অধিকার অর্জনে সক্ষম হতে যে পারিনি এই বাস্তব সত্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাষণে ও লিখনে লজ্জা দিচ্ছে। যেসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বারংবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, জাতীয়তার বিরোধী সেই সব সংকীর্ণ ভাব আজ প্রবল হয়ে দেশকে গ্রাস করতে চাইছে। সাম্প্রদায়িকতা এবং দলীয়তা প্রকট হয়ে উঠেছে, গণতন্ত্রের আড়ালে স্বার্থ ও সুবিধাবাদী ব্যক্তিচরিত্র ক্রিয়াশীল হয়ে নীতিগুলিকে পণ্ড করে চলেছে। শহর এবং গ্রামের উন্নত এবং অনুন্নত মানুষের শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ও জীবনধরণের মানের গুরুতর পার্থক্য স্বল্পই দূর হয়েছে। আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারছি যে তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়ার আগে গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে জাতীয় চরিত্র অর্থাৎ শিক্ষিত চরিত্রের শোধন আবশ্যক ছিল। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-সংগঠনের আদর্শ তখন আমরা নস্যাৎ করে দিয়েছিলাম, আজকের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আন্তরিক ও নীতিগত আয়াস সত্ত্বেও সম্ভবতঃ কর্মীদের চারিত্রিক দৈন্য এবং শ্রমবিমুখতা উদ্দিষ্ট সিদ্ধি থেকে দেশকে বঞ্চিত করছে। উনয়নমুখী বহু পরিকল্পনা কার্যে তেমন পরিণত করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া শিক্ষিত মানুষের দায়ীত্বপূর্ণ স্বদেশবোধ এসেছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের জনজাগরণের নীতি ছিল হাতে-কলমে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা, দেশের সবচেয়ে দুর্বল সবচেয়ে অসহায় মানুষকে স্বাধিকারে সমুন্নত করা, যার জন্য তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গী না পেয়ে। সামন্ততান্ত্রিক সংকীর্ণতা, শিক্ষিত বুর্জোয়াদের স্বার্থসিদ্ধির হীনতা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিলোপসাধনও একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল। সেই খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের চরিত্র স্মরণ করে আজ সংকোচের সঙ্গে দু'চার কথা লিখতে হচ্ছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি শুধুমাত্র সৌন্দর্য ও প্রেমের কবিই হতেন তাহলে যে উদ্‌যোগ সহকারে দেশবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর স্মরণোৎসবের আয়োজন করে থাকেন, এবং আপনারাও হয়ত গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তাতে যোগ দেন, তার ব্যাপকতার হ্রাস ঘটত বলে মনে করার কারণ আছে। কল্পলোক- সঞ্চারী আশ্চর্য কবিস্বভাব তাঁর, অথচ তার চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হল সেই কল্পনার সমসূত্র দেশ, সমাজ ও জাতীয়তার সঙ্গে তাঁর কবিজীবনের আদ্যন্ত সংযোগ, আর সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অজস্রবার দুর্লভ

মনস্বীতা ও হৃদয়বত্তার স্বাক্ষর রাখা। স্বদেশ ও সমাজের উন্নয়ন-কামনায় এতখানি আত্মনিয়োগ পৃথিবীর আর কোনো কবিকেই করতে দেখা যায় না। দেশের যেখানে দুর্বলতা সেখানে মূর্ত সমবেদনায়, জাতীয় জীবনের যেখানে যেখানে জড়তা সেখানেই আঘাত করে কবি এই মূর্ছিত মুমূর্ষু দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস করেছেন, অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধে ও ভাষণে, কাব্য কবিতায় তো বটেই। সেখানে আমরা আর ললিত-কবিকে পাই না, পাই কশাহস্ত সংগ্রামী সৈনিককে, দেশ ও সমাজের উন্নতির প্রয়াসে আত্মসমর্পিত সন্ন্যাসীকে, নিতান্ত অধীরচিত্ত দৈবপ্রেরিতের মত এক আশ্চর্য মানবসন্তানকে। 'ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা' এই উদ্বোধন-মন্ত্র দিয়ে কবির জাতীয় জাগরণের প্রারম্ভ, আর জাতিবর্ণভেদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং যাবতীয় মধ্যযুগের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ সংগ্রামের তুর্যনিনাদে এর সমাপ্তি। আমাদের সংকীর্ণ জরাজীর্ণ মানসিকতায় যৌবনের জোয়ার লাগুক, নিঃশেষে ভেসে যাক প্রথা ও শাস্ত্রের জঘন্য জঞ্জালের স্তূপ, এই তাঁর চিরতারুণ্যময় বাণী।

যেমন পরাধীনতার, তেমনি সামাজিক দীনতার অর্থাৎ শ্রেণী-বৈষম্যের নিষ্ঠুর শোষণের ছবি কবিকে কোনো সময়েই স্থির নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়নি, প্রতিবাদী ও সংগ্রামী স্বভাবের করে তুলেছে। "তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা। / এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।" এ যেমন সমাজের পক্ষে সত্য, তেমনি তাঁর নিভৃত অন্তজীবনেরও যথাযথ পরিচয়। কবি যদি তাঁর কাব্যস্বপ্ন নিয়েই মশগুল থাকতেন, আমাদের চিত্তে, কেবল সাহিত্য- ভাবনা ঘিরে কবির প্রভাব এত ব্যাপক হত কিনা সন্দেহ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকে আকাশবিহারী কল্পনার সঙ্গে জাতীয় আদর্শবোধ সমন্বিত হয়েই একত্র আশ্রয় পেয়েছে, আশ্চর্য ব্যাপার হলেও এটি সত্য, এবং আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

দেখা যায়, তারুণ্য থেকে আরম্ভ করে কবির লেখনী উত্তরোত্তর প্রতিবাদেই চালিত হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবাদ (১) সাম্রাজ্যস্বার্থপর বণিকের রক্ষক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে (২) স্বদেশী আন্দোলনের ভিক্ষুকবৃত্তির বিরুদ্ধে এবং (৩) ইংরেজ সিভিলিয়ান ও তাদের আশ্রয়পুষ্ট সুতরাং ইংরেজপদলেহী জমিদারদের বিরুদ্ধে। এ হল কবির কুড়ি বাইশ বৎসর বয়সের কথা। দেশসম্বন্ধে সেই প্রাথমিক সচেতনতা, তখন কবি " হিন্দুমেলা'র আত্মনির্ভরতার আদর্শে দীক্ষিত। বণিক-শোষণের স্বরূপ সে-ই বুঝতে আরম্ভ করেছেন, ইংরেজদের দেওয়া 'এ্যাজিটেটর' আখ্যার স্বাদেশিকদের – লাটসাহেবের কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য নেওয়ার অথবা সিভিল সার্ভিসে কি জুরিতে ভারতীয়দের স্থান দেওয়ার আবেদন-নিবেদনের ছেলেমানুষি উপলব্ধি করেছেন। তখনকার 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত কবির

ন্যাশন্যাল ফণ্ড, টাউন হলের তামাশা, হাতে-কলমে, মন্ত্রী- অভিষেক প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং প্রসঙ্গ-কথার মন্তব্যগুলি কবির প্রকৃত স্বাদেশিকতায় জাগরণের প্রাথমিক চিহ্ন বহন করে। স্বদেশবাসী শিক্ষিতদের আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন দীনতার প্রতিকারে কবির সেই প্রথম পদক্ষেপ। কবিতায় কবির এই অসহতার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়- ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন, অথবা, আমার বোলো না গাহিতে বোলো না- প্রভৃতির মধ্যে। কবির জাতীয় মর্যাদাবোধের উচ্ছ্বসিত অবারিত প্রকাশ দেখা গেল তাঁর ঠিক তিরিশোত্তর বয়ঃক্রমে।

এই সময়ে কবি শিলাইদহে জমিদারি দেখার কাজের সঙ্গে শোষিত লাঞ্ছিত কৃষকদের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করছেন, মফস্‌সলে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের দেশীয় মানুষকে ঘৃণ্য এবং অপমান করার নিত্যকার কাহিনী সব শুনছেন এবং বাস্তবে উপায়ান্তর না পেয়ে লেখনীমুখেই সংগ্রাম জানিয়েছেন বারংবার । তাঁর এই সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিচ্ছে 'সাধনা' পত্রিকায় চার-পাঁচ বছরে প্রকাশিত অজস্র প্রবন্ধ- ইংরেজ ও ভারতবাসী,ইংরেজের আতঙ্ক অপমানের প্রতিকার (যাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে ঘুষি খেয়ে ঘুষি ফিরিয়ে দিতে হবে, পাল্টা মার না দিতে পারলে বর্বরের শিক্ষা হবে না), তা ছাড়া,- সুবিচারের অধিকার, রাজা ও প্রজা, রাজনীতির দ্বিধা প্রভৃতি প্রবন্ধ। আজকের দিনের প্রগতি আন্দোলনের পথবর্তীরা এর একটা প্রবন্ধ মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখবেন, শাসক ও শোষক ইংরেজদের প্রতি কবির কী বিদ্বেষ এবং স্বদেশীয় ইংরেজপদলেহীদের উপর কবির কী তীব্র ঘৃণা। কাব্য-কবিতায় এই সময়কার অভিব্যক্তি হল – 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা যা বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও মৃত্যুবরণের পথে একদা চালিত করেছিল এবং 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে' অথবা 'চার ন পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, হেরিব না দিক/ গণির না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার, উদ্দাম পথিক- এই রকম জড়ত্বঘাতী উৎসাহের বাণী। রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকেরা ভালো করে পড়ে দেখবেন, কবির লেখা গদ্য-পদ্যে চিঠিপত্রে কোথাও দ্বিচারীতা নেই, একমুখে একই আদর্শের উচ্চারণ চলেছে সর্বত্র। ইংরেজ শাসনের প্রতিকূলে একত্রিত হওয়ার কথা কেবল স্বাদেশিকেরাই বলেন নি, কবিও বলেছেন, যদিও কবির আদর্শ ছিল স্বতন্ত্র।

কবিকে এই সময় খুব বেশি আহত করে ইংরেজিতে- শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান সৃষ্টি এবং শিক্ষিতের পক্ষে নম্র ও সরলচিত্ত গ্রামীণ মানুষকে 'অশিক্ষিত অভদ্র চাষা' 'ছোটোলোক' প্রভৃতি সম্বোধন। কবি ঠিক উপলব্ধি করেন যে জাতপাঁত এবং ধর্মসম্প্রদায়ে বহুধা-বিভক্ত ভারতীয় সমাজে এ আর এক নোতুন ঢঙের বিভোদের ও শ্রেণীশোষণের আবির্ভাব। এই নোতুন আপদটা দূর হয় যদি

মাতৃভাষায় শিক্ষার বিধি প্রবর্তিত হয়। ভাষণ দিলেন, লেখনী চালনা করতে লাগলেন শিক্ষাপদ্ধতিতে এই সংস্কার আনার জন্য। এ বিষয়ে তিনি প্রথম স্পষ্ট অভিমত জানালেন "শিক্ষার হেরফের" নামক নিবন্ধে এবং কয়েক বৎসর পরে দলবদ্ধ হয়ে নাটোর প্রাদেশিক সম্মিলনের ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। দেশের লোকের শতকরা নব্বই জন যেখানে ইংরেজিতে অশিক্ষিত, সেখানে ইংরেজিতে কাজকর্ম চালানো কী পরিমাণ অস্বাভাবিক অবুদ্ধি অথবা বুর্জোয়া চরিত্রের ইতরতা তা রবীন্দ্রনাথই বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। তারপর থেকে দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে জীবনের অপরাহ্ন পর্যন্ত কবিকে বারংবার লেখনী চালনা করতে হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাছে বিবৃতি দিতে হয়েছে, আর এ-সবের মধ্যে তাঁর সেই একটা কথাই বারংবার দেখা গেছে- আগাগোড়া সব শিক্ষার ব্যবস্থা মাতৃভাষাতেই হবে। ইংরেজি সম্বন্ধে তাঁর এই অভিমত প্রকাশ পেয়েছে যে, ইংরেজি আমাদের শিখতে হবে, তবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে। স্যাড্‌লার কমিশনের কাছে শিক্ষার ভাষানীতি নিয়ে তাঁর বিবৃতি ইংরেজি ও বাঙ্‌লার সম্পর্ককে পরিস্‌ফুট করেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে ইংরেজির মাধ্যমে মুখস্থবিদ্যায় কৃত্রিম শিক্ষা পেয়ে শহরে শতকরা দু'চারজন মাত্র ইংরেজ-শাসনের কাজে লাগছে, অশিক্ষিত মানুষকে ঘৃণা করছে, গ্রামীণ আশি-নব্বই জনের জীবনের সঙ্গে তাদের জীবনধারা পৃথক হওয়ার শ্রেণীবৈষম্য চলছে, ইংরেজি-শিক্ষিতেরা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। শহরবাসী জমিদারদের সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ। প্রতিবাদ যেখানে প্রয়োজন সেখানে এই মহাকবিই তাঁর সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব নিয়ে সর্বাগ্রে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এমনকি এককভাবেও প্রতিরোধ করতে প্রয়াস করেছেন। যেমন, বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে সংবাদপত্র সাময়িকপত্রের ইংরেজ- সমালোচনা বন্ধ করার জন্য আনা সিডিশন বিলের প্রতিবাদ। বিখ্যাত 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে ঐ জাতীয় বণিক্‌শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছিল।

চল্লিশোত্তর রবীন্দ্রনাথের তেজস্বী ব্যক্তিত্বের এক স্বাক্ষর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠন। আর এক, গ্রাম-স্বরাজ স্থাপনের আগ্রহ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ভারতের প্রথম স্বাধীনতার আন্দোলন। এতে রবীন্দ্রনাথ কিরকম সাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন এবং মুহুর্মুহু গান ও কবিতা রচনা করে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেছিলেন তা অনেকেরই জানা। কিছু পরে অবশ্য মতপার্থক্যে এবং হিন্দু-মুসলিম বিভেদের ফলে ঐ আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু কবি সেই যে স্বাদেশিকতায় কার্যকরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলেন, দেশের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ নিতান্ত অবহেলিত ও মানবিক অধিকারে বঞ্চিত কৃষকশ্রেণী সেই যে তাঁর অন্তঃকরণ দখল করে নিলে, তা তাঁর স্বকীয় উদ্‌যোগের স্থায়ী পরিচয় চিহ্নিত করেছে তাঁর জীবনের

শেষ দিন পর্যন্ত । কৃষক ও কৃষির উন্নয়ন, পল্লী-সংগঠন, গ্রাম-স্বরাজ বিষয়ে কবির বাস্তব কর্মের আদর্শ আজকের স্বাধীন রাষ্ট্রেও আদর্শস্থানীয় হয়ে রয়েছে।

শোষিত সর্বহারা কৃষকদের সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বসিত আবেগের কাব্যিক পরিচয় প্রথম ফুটেছিল 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার- " ঐ যে দাঁড়ায়ে নতশির" প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে, সেই ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে, দেশের স্বাদেশিকেরা যখন শহরে তাঁদের আবেদন-নিবেদন নিয়েই ব্যস্ত। তারপর চিত্রিত হল 'সুপ্রভাত' কবিতায়, যে কবিতাটির আসল মর্ম না বুঝেই আমরা মুষ্টিবদ্ধ আস্ফালন করে আবৃত্তি কবি-উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ইত্যাদি। আসলে এই কবিতাটি লেখা হয় প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা উপলক্ষ্য করে সেই ১৯০৭ খ্রীঃ। এই অদ্‌ভুত অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা যখন ঘটল, কবি অনুভব করলেন যে তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের মূলেই একটা গলদ থেকে গেছে। গ্রাম-সংগঠনের মধ্য দিয়েই দুই সম্প্রদায় কাছাকাছি আসবে এবং তাতে তাদের স্থায়ী সামাজিক মিলন সম্ভবপর হবে। এজন্য স্বাদেশিকদের দৃষ্টি তিনি গ্রামের উভয় সম্প্রদায়ের সর্বহারা মানুষের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যত্ন নিলেন আবেগময়ী ভাষায় রুদ্রকে সম্বোধন করে-

তোমার শ্মশান-কিংকরদল দীর্ঘ নিশায় ভুখারি।
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে, করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ পরে
খোল খোল দ্বার, ওগো গৃহস্থ, থেকোনা থেকোনা লুকায়ে।

আর এই গ্রাম-উন্নয়নে গ্রাম-স্বরাজে স্বাদেশিকেরা কেউ যখন আগ্রহ দেখাল না, তখন কবিই "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে" –এর মর্মকথা সার করে মাত্র দু'চারজন কর্মী নিয়ে সংগঠনের কাজে ঝাঁপ দিলেন। তাঁর জমিদারির অধীন দুটি পরগনায় শিক্ষার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ঋণ থেকে ত্রাণের ব্যবস্থা, সমবায়, এমন কি পঞ্চায়েতী বিচার পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করে, ট্রাকটার দিয়ে একত্রিক চাষ প্রবর্তনের পথ দেখিয়ে অসহায় মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের পথ খুলে দিলেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কতদূর আন্তরিক ছিলেন তা তাঁর শ্রীনিকেতনের কার্যবলীও প্রমাণ করে। নিপীড়িত মানুষের উন্নয়নে কবির এই আত্মদান স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকা উচিত। পরে ১৯৩০ খ্রীঃ সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শন করে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এতদিন তিনি যা যা করে এসেছেন, রাষ্ট্র-সহায়তায় তারই ব্যাপক উদ্‌যোগ সেখানে হয়েছে- শিক্ষাবিস্তারে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে, ঐকত্রিক ও যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থায়। কবি আগাগোড়া পরিতাপ করেছেন যে দেশের শিক্ষিতদের দৃষ্টি এদিকে গেল না। দেশের মানুষকে অশিক্ষায় এবং দারিদ্র্যে

এবং মহাজন ও নায়েবের শোষণে পশুর স্তরে নিগৃহীত দেখেও শিক্ষিতদের সহানুভূতি ও কর্মে উৎসাহ জাগে না।

অন্যায়ের প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রখর মূর্তি দেখা গেল জালিয়ানওয়ালার হত্যাকাণ্ডে। পরে যেমন হিজলী কারার বন্দীদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধেও কবিচিত্তে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। সেই সবে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। অধিকারের দাবিতে শত্রুর অমানুষী নির্যাতনের মুখেও অহিংসা- এতবড় আধ্যাত্মিক আদর্শ গ্রহণ করতে দেশবাসী চেষ্টা করেও অপারগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় কর্তব্য অনুসারে গান্ধীজীর কাছে এবিষয়ে সাবধান-বাণীও পাঠিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই নির্যাতিক মানুষ অত উঁচুতে উঠতে পারেনি। এজন্য গান্ধীজীকে বারংবার সত্যাগ্রহের আন্দোলনের ডাক দিয়ে বারংবার তা প্রত্যাহার করে নিতেও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও তাঁর নীতি মানতে পারেন নি। লেখনীমুখে পত্রে-প্রবন্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন। তাঁর চরকা, সত্যের আহ্বান প্রভৃতি বিশিষ্ট কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে যাতে তাঁকে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে গান্ধীজীর ঐসব আদর্শ অবাস্তব এবং যান্ত্রিক বলে। এজন্য তৎকালীন ভারতে মহামানব নামে আখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে মতপার্থক্যের ব্যাপারটিকে বিন্দুমাত্র আমল দেন নি তিনি। গান্ধীজীর খিলাফত আন্দোলনের অসারতার বিষয় তিনি পূর্বাহ্নেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে বারংবার জানিয়েছিলেন যে রাজনীতির কৌশলের দলিলে মিল হবে না, মিল হবে সামাজিকতায়, গ্রাম-উন্নয়নের মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক সমাধানকে তৃতীয় পক্ষ ইংরেজ যে বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা করবেই, এ তো জানা কথা। ইতিহাস দেখেছে, আমাদের স্বাধীনতা- আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর সমাধান সম্ভব হয়নি, দেশবিভাগ অনিবার্য হয়েছে।

স্বাধীনচেতা রবীন্দ্রনাথের আর এক প্রতিবাদের ভূমিকা হল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আবির্ভূত এবং ক্রমাগত পরিবর্ধিত পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির উগ্র জাতীয় অহমিকা এবং সেই সঙ্গে সাম্রাজিক শোষণযন্ত্রের পোষণ। এই নিয়ে তিনি জাপানে আমেরিকায় যেসব বক্তৃতা করেন তা সেখানকার অধিবাসীরা, বিশেষে সংবাদপত্রগুলি, অভিনন্দিত করে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে পশ্চাৎপদ না হয়ে তাদের ধনতান্ত্রিকতার সপক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়োগের বিরুদ্ধে বারংবার তাঁর মানবিক অনুভব ব্যক্ত করেছেন। সেই ১৯২০-২২ খ্রীঃ যখন এদেশের স্বাদেশিক মহাত্মারা পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের মূলস্বরূপ অর্থাৎ ধনতান্ত্রিকতা বা বাণিজ্যিক শোষণ

বিষয়ে অবহিত হাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি, তখন আমাদের মহাকবিকেই জাগ্রত দেখে বিস্ময় বোধ করতে হয়। পশ্চিম না হয় কবির মানবিক মিলনের বাণী নাই নিলে, কিন্তু কবিকে এর জন্য প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে স্বদেশের মাটিতেই। পশ্চিমের অনুকরণে ভারতেও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা আত্মসর্বস্বতা আসছে এমন অনুমান করে কবি একটি ভাষণ ও নিবন্ধ রচনা করেন, তার নাম, Nationalism in India. এই প্রবন্ধটির জন্য বিপিনচন্দ্র পাল ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কবিকে লেখনীমুখে তীব্রভাবে আহত করেন। উক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভিক বাক্যটিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছিলেন যে- Our problem in India is not political. It is social. এই কথায় দেখতে গেলে স্বদেশী আন্দোলনের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন যে পশ্চিমের অনুকরণে পোলিটিক্যাল আন্দোলন পশ্চিমের সঙ্গে বিরোধই বাড়িয়ে তুলছে, আর ভারত উগ্র জাতীয়তার দিকেও যাচ্ছে। আমাদের সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ-সমস্যার সমাধান আগে করে নিয়ে, স্বাধীনতার যোগ্য হয়ে, তবেই স্বাধীনতা চাওয়া উচিত। বস্তুত এই উপলব্ধি বহু পূর্ব থেকে তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত একটি স্থায়ী উপলব্ধি। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি শিক্ষা বিলাতি বস্ত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠার ধারায় এর আতিশয্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সাবধান করতে চেয়েছিলেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে ভারতীয় শিক্ষা-ধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার যাতে একান্ত বিরোধ না ঘটে এবং ইয়োরোপের অনুসরণে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এদেশে প্রসারলাভ করে রবীন্দ্রনাথ তা-ই চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শরৎচন্দ্র তখন এর প্রতিবাদ করেন। সে যাই হোক, খ্রীঃ ১৯২০ থেকে ৩০ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রচলিত স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল প্রতিবাদী হিসাবেই দেখা যায়। কবির এ প্রবৃত্তি ভালো কি মন্দ তার বিচারে না গিয়ে শুধু এই কথা বললে অন্যায় হয় না যে সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার প্রতিকার বহু-অধ্যবসায়-সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও একযোগে লেগে পড়ে তখনই যদি কাজে নামা যেত তাহলে স্বাধীনতা-উত্তর-কালে এই বিভেদের আক্রমণ এবং ব্যাপকভাবে অবক্ষয়িত শিক্ষিত-চরিত্রের গ্লানি থেকে দেশটা পরিত্রাণ পেতে পারত।

রবীন্দ্র-জীবনের মধ্যবর্তী অধ্যায়টি অর্থাৎ গীতাঞ্জলি পর্ব থেকে মহুয়া পর্ব পর্যন্ত অধ্যায়টি প্রাবন্ধিক ও কবির লেখনী থেকে প্রগতিমূলক বেশ কিছু রচনার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকে স্বদেশের সমাজ গঠনে নিমগ্ন কবি অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের প্রতি আমাদের আচরণের প্রতিবাদে লিখেছেন বিখ্যাত 'অপমান' কবিতা এবং 'অচলায়তন ' নাটক। 'অপমান' কবিতাটিতে যদিও কবি আক্ষেপ করেছেন ও বিধাতাপুরুষের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন, অচলায়তনে বাস্তব সংগ্রামের মধ্যস্থতায় নিম্নবর্ণের লাঞ্ছিত মানুষের সমস্যার সমাধান করেছেন।

বলাকায় কবির চিত্ত-পরিবর্তন এবং সংগ্রামকে অভিনন্দনের আগ্রহের দিক সকলেরই পরিচিত। 'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো' 'দূর হতে কী শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন' " তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা, এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা" প্রভৃতি রচনা তখন বিপ্লবীদের মুক্তি- আন্দোলনের সহায়ক হয়েছে, যদিও এমনই হওয়া সম্ভব যে এই উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কবি আমাদের নিজেদের মধ্যেকার সংগ্রামকেই লক্ষ্য করেছেন। এর পরেই লেখা "মুক্তধারা" নাটক অমানবিক রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আর "রক্তকরবী" ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলে নিরক্ত নিষ্প্রাণ মানুষের উদ্ধারকল্পে লেখা। এদেশে রবীন্দ্রনাথই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচারী প্রথম ও প্রবল লেখক। রক্তকরবীতে রাজা বা ধনতন্ত্রের ইতিহাসের নিয়মে আপনা থেকেই অপসৃত হওয়ার মধ্যে কবি কিন্তু শ্রমিকদের বিদ্রোহ –বিপ্লবেরও প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। এই দুটি নাটক, বিশেষে রক্তকরবী তখনকার সাম্যবাদী আন্দোলনে এবং ধনতন্ত্রের স্বরূপ বিষয়ে আমাদের চৈতন্যের জাগরণে প্রভূত সহায়তা করেছিল এ বলাই বাহুল্য। কিছুকাল পরে লেখা 'কালের যাত্রা'য় তিনি রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে শূদ্রদের অর্থাৎ শ্রমিকদের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন এবং 'তাসের দেশে' কুসংস্কারে জর্জর দেশের জড় সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতিকে তিনি ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করে ছেড়েছেন। 'তাসের দেশই' তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য লেখা যাতে তিনি স্বদেশের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে আঘাত করে দূর করতে চেষ্টা করেছেন, অথচ যা আজও আমরা ছাড়তে পারিনি, পরম উল্লাসে বছর বছর রবীন্দ্র-জয়ন্তী করা সত্ত্বেও।

কবিমনীষীর বিদ্রোহী স্বভাবের স্বাক্ষর বহন করছে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেটা হল ১৯৩৮-৩৯ এর কথা। রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে কংগ্রেসের মন্দিরে ভিতরে ভিতরে শক্তিপূজার একটি বেদী প্রস্তুত হয়েছে এবং সেখান থেকে হিটলারী নীতি চলছে। নেতাজী সুভাষ ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতির পদ ছেড়ে দিলে পর রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর সমর্থন জানালেন ও 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রকেই অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে বরণ করলেন। নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসকেই রবীন্দ্রনাথ এতকাল দেশের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বরণ করে এসেছিলেন, কিন্তু এখন আর তা পারলেন না। শেষ জীবনেও সাহসিকতা ও স্পষ্টভাষণের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এরপর দেশে চলতে লাগল ইংরেজের ক্ষমতা- হস্তান্তরের অভিনয়। আর সেই সঙ্গে সেই পুরানো হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, সুভাষচন্দ্রের নাটকীয় দেশত্যাগের ঘটনা। মৃত্যুর মাসদুয়েক আগে রোগশয্যায় শায়িত থেকেও কবি প্রতিবাদ জানালেন মিস্ র‍্যাথ বোনের ভারত - নিন্দার। আমরা নিশ্চিত অনুমান করতে পারি যে কবি মানসিক শান্তি নিয়ে শেষের

দিনগুলি কাটিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ, দেশে বিভেদ, অনৈক্য এবং সংকীর্ণতা তেমনই থাকল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁর উচ্চারিত ও দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রদর্শিত গঠনমূলক স্বাদেশিকতার পথে দেশ চল্‌ল না। স্বায়ত্তশাসন পেলেও এর ফল যা দাঁড়াবে, ভবিষ্যৎ -দ্রষ্টার মত রবীন্দ্রনাথ তা পূর্বাহ্নেই বুঝেছিলেন। অথচ দেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে হতাশা কবিকে আত্মকেন্দ্রিকতায় পিছিয়ে নিয়ে যেতেও পারেনি। দেশের গুরুতর সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন কবি পথ- নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভারতের যথার্থ মুক্তি যে শিক্ষাদীক্ষাহীন নির্যাতিত কোটি কোটি মানুষের উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে –তাঁর এই উপলব্ধি ভারতে বাস্তবায়িত হতে আর কত বিলম্ব হবে কে জানে?

গণচৈতন্যের জাগরণে রবীন্দ্রনাথ

মহাকবির জীবনে সাহিত্যিক স্বপ্নাবেশ ও সমাজ- অভিঘাতের প্রবাহ পাশাপাশি চলেছিল, কী ছন্দিত পদ্যে, কী গদ্য রচনায়। অবরুদ্ধ সমাজ–জীবনের গতানুগতিকতা উল্লঙ্ঘনের প্রথম পরিচয় আভাসিত হয়েছিল তাঁর একুশ বছর বয়সের লেখা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। তারুণ্যের অতিরিক্ত ভাবাবেগে কবিতাটি আদান্ত উচ্ছ্বসিত এবং খানিকটা অস্পষ্ট হলেও এটা বেশ বোঝা যায় যে কবি একটা কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাচ্ছেন। নতুবা- আজি চারিদিকে মোর/ এ কী কারাগার ঘোর/ ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা/ আঘাতে আঘাত কর- এরকম প্রবল সোচ্চার ভাষণ সম্ভব নয়। কবির স্বজন- পরিবেশের দিক থেকে এ ধরনের তীব্র প্রতিবাদের কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। আমরা মনে করি এটা কবির অস্ফুট চৈতন্যে স্বদেশের অমানবিক সমাজ – পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যে- কারণে দু'বছর আগে ইংল্যাণ্ড- প্রবাসের মধ্যে এদেশের সমাজ –কাঠামোর বন্ধন থেকে মানুষের, বিশেষে নারীর মুক্তির বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ জেগেছিল। যে –কারণে স্বল্প পরেই তাঁকে জানাতে হয়েছে- 'এস, ছেড়ে এস সখী, কুসুম-শয়ন/ চল, গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে' এবং উত্তরোত্তর তীব্রতা ও প্রবলতার সঙ্গেই। যেমন, 'সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়'; 'শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া' সুতরাং ' লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে' এবং পরিশেষে 'বাঁধ ভেঙে দাও, জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্' প্রভৃতির মধ্যে। আর কেবল কাব্য-কবিতাতেই নয়, অসংখ্য প্রবন্ধে নিবন্ধে ভাষণে। মূল স্বভাবে আমাদের কবি যদিও সমুচ্চ কল্পনাপ্রবণ, রোম্যান্টিক এবং নিরুদ্দেশ সুদূর বা অজানার যাত্রীও, তবু দেখা যায় একই সঙ্গে ভারতীয় সমাজের শূদ্র-বিরোধী শোষণ- ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার এবং সদ্য-বিস্ফারিত ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক অজগর গ্রাস তাঁকে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ করেছিল। এ দুয়ের বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করা তিনি সামাজিক ও সাহিত্যিক কর্তব্য বলে স্থির করেছিলেন এবং এই কারণে তিনি জীবনের মহাকবি, কেবল ব্যক্তিগত স্বপ্নবিলাসী নন। তিনি চলিষ্ণুভাবে রোম্যান্টিক, নিসর্গ এবং জীবন তাঁর মধ্যে বাস্তবে ও কল্পনায় একত্র সমহিত, এমনকি আধুনিক বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব তাঁর কল্পনায় সমাকৃষ্ট হয়ে তাতে একত্রিত হয়েছে- আমাদের পূর্ব- পরিচিত মহাকবিদের মধ্যে যা দেখা যায় না।

কবির সমাজবোধ স্ফুরিত হয়েছিল যৌবনারম্ভ থেকেই, ভারতী- পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ- আলোচনা তার প্রমাণ। এই সময় থেকেই ইংরেজ প্রশাসকদের নেটিভ-ঘৃণা, চীনে উপনিবেশবাদীদের বাণিজ্যিক আগ্রাসন, দেশীয় জমিদারদের কপট প্রজাহিত- বাসনার তামাশা, স্বদেশী আন্দোলনকারীদের পদাধিকার-ভিক্ষার

সঙ্গে ইংরেজ-তোষণ, ইলবার্ট বিলের সমাধি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ স্ফুরিত হতে দেখা যায়, আর এখন থেকেই তাঁর চিত্তে স্বদেশিকতায় সেই বিশিষ্ট বীজটি অঙ্কুরিত হতে দেখা যায় যে, ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীনতা পাব না, অপমানই পাব এবং প্রকৃত স্বাধীনতার পথ হচ্ছে নির্যাতিত নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত ও সরল করে সংগঠিত করে মানবিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা আর এইসঙ্গে শিক্ষার সার্থকতার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যম- যার বিকল্প হয় না। ভারতী-পত্রিকায় প্রকাশিত "শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা, ছলনা। আমার বোলো না গাহিতে বোলো না" এবং "তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ, আগে চল আগে চল ভাই" প্রভৃতি বহু গানের মধ্যেও তিনি তাঁর প্রাথমিক স্বাদেশিক অনুভবগুলি ব্যক্ত করতে লাগলেন। এর পরই প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করলেন বঙ্কিম- ভাবনাধারা থেকে বিকৃতভাবে উৎসাহিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও চন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুয়ানির আতিশয্যের বিরুদ্ধে। তারপর সাধনা-পত্রিকা প্রকাশিত হতেই অর্থাৎ ১৮৯১ সাল থেকেই প্রায় উঠে-পড়ে লাগলেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের দুঃশাসনের স্বরূপ প্রকাশ করতে। সাঁওতাল- বিদ্রোহ, আফ্রিকায় আদিবাসী –নিগ্রহ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টি, ক্ষমতাসীন ইংরেজ প্রশাসকদের ঔদ্ধত্য, সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ প্রভৃতি স্পষ্ট করে তুলতে লাগলেন প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে। সেই সঙ্গে স্বদেশবাসীকে উদ্দীপিত করতে চাইলেন মনুষ্যত্বে ও মানবিকতায়- ইংরেজ-অধিকারকে অনৈতিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে নির্লজ্জের মত পদাধিকার- ভিক্ষা না চাইতে। এই সময়ে কবি প্রায়ই শিলাইদহে। ঠাকুর- পরিবারের জমিদারির কাজকর্ম দেখতে গিয়ে কিন্তু এক করতে আর হয়েছে। মুক্তমনা কবি দেখলেন জোতদার- মহাজনের নিপীড়নে ও শোষণের ফলে কৃষককুল ও ভূমিশ্রমিকদের ঋণে-পঙ্গু গুরুতর জর্জরিত অবস্থা। প্রকৃত স্বদেশ সম্পর্কে এখন থেকে তাঁর বিশেষভাবে চোখ ফুটল। তিনি যে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখলেন 'এবার ফিরাও মোরে' নামক বিখ্যাত কবিতায় তার বর্ণনা দিলেন- ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির/ ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দী/ বেদনার করুণ কাহিনী, ইত্যাদি। এবং বর্ণনা দিয়েই স্বদেশবাসীকে আহ্বান করলেন এর প্রতিবিধান করতে –ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা!

তিনি নিজে এই পশু-কৃত মানুষদের দুর্দশা মোচনের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন এবং দেশ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে স্বল্প সম্বল নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন পল্লী-মানুষ সংগঠনে। মাটির কাছাকাছি থাকা হীনীকৃত হিন্দু- মুসলমান মানুষগুলির জন্য প্রথম ভাবলেন ঋণ- মোচনের ব্যবস্থায় বিষয়, আর সেই সঙ্গে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তোলার কথা। তারপর ভাবলেন পথঘাট সংস্কার, স্বাস্থ্য- উন্নয়ন ও পানীয় জলের ব্যবস্থার বিষয় এবং ক্রমে সমবায়-নীতির মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন, জোতদার-মহাজনের গ্রাস থেকে রক্ষা, আর কলহ- নিষ্পত্তির জন্য সালিশী বিচার। এ বিষয়ে তখনকার স্বাদেশিকদের চিত্ত

উদ্‌বোধিত করতে চাইলেন। লিখনে ভাষণে আবেদন জানাতে লাগলেন, এমন কি সতর্কও করে দিতে চাইলেন যে মানুষ সংগঠনের আগে যেন- তেন- প্রকারে স্বয়ংশাসন পাওয়া গেলেও তা শেষ পর্যন্ত মুষ্টিমেয়ের যা-খুশী –তাই করার অধিকার পরিণত হবে। কোটি কোটি মানুষ থাকবে অশিক্ষার তমিস্রায়, ভারবাহী পশুজীবন যাপন করে। আগে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া, না , আগে সামূহিক সংগঠন এই দুই নিয়ে কোনো বিতর্কের আয়োজন তখন হয় নি, কিন্তু ভূমি-সংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি মিলিয়ে আজ দেখা যাচ্ছে কবির আবেদন কাল্পনিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিয়ে আমরা ভুলই করেছি। যাই হোক, স্বদেশী নেতাদের কেউ যখন কবির কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং আবেদন- আন্দোলনের পথ আঁকড়ে রইলেন, তখন নিরুপায় হয়ে কয়েক বৎসর পরই কবি নিজে তাঁর স্বল্প সম্বলের উপর নির্ভর করেও কয়েকজন কষ্টসহিষ্ণু সহায়ক নিয়ে তাঁর সীমিত জমিদারি এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানুষ সংগঠনের পথে এবং যা করতে চাইলেন তাকে দীনদুঃখী মানুষের পরিত্রাণ না বলে ইংরেজ শাসনের সমান্তরাল স্বয়ংশাসিত সরকার গঠনই বলা চলে। ইতিমধ্যে যে ঘটনা তাঁকে দ্রুত গ্রাম- সংগঠনের অভিমুখে চালিত করলে তা হল বঙ্গবিচ্ছেদ এবং সে বিষয়ে আন্দোলন ও তার ফলাফল।

১৯০৪ সালে বঙ্গবিচ্ছেদের কর্জনী পরিকল্পনা শোনা যেতেই কবি লিখলেন ‘পাগল’ নিবন্ধ এবং কিছু পরেই বিখ্যাত “ স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধ। এটিই তাঁর প্রাথমিক গ্রাম- সংগঠনের আহ্বান। ইতিমধ্যে বঙ্গ-বিচ্ছেদ আইন কার্যকরী হতেই একে উপলক্ষ্য করে ভারতের প্রথম ও প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলন জন্ম নিলে। বঙ্গভঙ্গ- প্রতিরোধ আন্দোলনে আমাদের কবি প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিলেন এবং ‘বাঙলার মাটি বাঙলার জল’ ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’ ‘ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে’ প্রভৃতি বেশ কয়েকটি বাউল সুরের গানে প্রতিরোধ আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য উৎসাহিত করলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল বিলাতী পণ্য বয়কট করার নীতিতে এবং ইংরেজ প্রশাসকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মুসলমানেরা এ আন্দোলনের বিরোধীতা করছে তখন রবীন্দ্রনাথ চিন্তাকুল হয়ে পিছিয়ে গেলেন এবং গ্রাম- সংগঠন প্ল্যানে একযোগে কাজ করতে করতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আসবে এই ধারণায় স্থির হলেন। ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভুল-বোঝাবুঝি চরমে উঠে ১৯০৭ সালে জামালপুর- ময়মনসিংহে দাঙ্গা আরম্ভ হল। এই হল ভারতের সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রবীন্দ্রনাথ হতবাক্ হয়ে ‘সুপ্রভাত’ কবিতায় নিজ মনোভাব ব্যক্ত করে গ্রাম-সংগঠনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ করলেন এবং পরপর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধে এবং পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের ভাষণে সংগঠন, বিশেষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরতে লাগলেন। এই সঙ্গে তিনি জাতিবর্ণভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হলেন।

‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধ, ‘অপমান’ কবিতা ও ‘অচলায়তন’ নাটক কবির এবিষয়ে প্রবল বিক্ষোভ প্রকাশ করছে।

এই সময়ে আমাদের মহাকবি কর্মক্ষেত্রে দুই তরবারি ঘুরিয়েছেন। এক দিকে এই গ্রাম-স্বরাজ প্রবর্তন ও অন্যদিকে ইংরেজি স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অতৃপ্ত হয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম- বিদ্যালয় প্রবর্তন। ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণে মাতৃভাষার আশ্রয় বরণ কবির শিক্ষাভাবনার একটি বিশেষ দিক। এর সঙ্গে তিনি মেলালেন প্রাচীন তপোবনের মুক্ত শিক্ষার আদর্শ কল্পনা। এই নিয়ে কোলকাতায় শান্তিনিকেতনে এবং বাইরেও প্রবন্ধে ও ভাষণে তিনি প্রচার কার্যে লাগলেন। কিন্তু কিছু দিন না যেতেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে তপোবন –বাদের সঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষণশীলতা যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রকৃত জনশিক্ষার আদর্শ এটি হচ্ছে না, তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে ইয়োরোপীয় প্রগতিমূলক চিন্তার সঙ্গেও এর যোগ থাকছে না। সুতরাং সমন্বয়ে ও পরিবর্তনে আগ্রহী হলেন। বাঙলার মাধ্যমকে মুখ্য রেখে গৌণভাবে ইংরেজি শিক্ষা, জনশিক্ষার জন্য বিশ্বভারতী, ক্রমান্বয়ে গড়ে তুললেন। কৃষি-বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা, স্মাজ-সেবা শিক্ষণও পরে এসবের সঙ্গে যুক্ত করলেন। যে ব্যাপারটি কবিকে অসংশয়িত প্রগতির অর্থাৎ মানবমুক্তির অভিমুখে নিয়ে এল তা হল প্রথম মহাযুদ্ধ এবং প্রায় একই সময়ে ‘সবুজপত্রে’র প্রকাশ। এখন থেকে আমাদের কবি হয়ে উঠলেন পুরাতনকে ভাঙার অগ্রদূত, জীর্ণ প্রথায় সামন্ততান্ত্রিক জীবনকে ত্যাগ করে যৌবনের পথিক।

প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁর চিত্তে উদ্‌বোধনের সংগীত নিয়ে এল। একদিকে তিনি যেমন সাম্রাজ্যবাদী বুভুক্ষায় মানুষগ্রাসের পরিচয় পেলেন (‘লড়াইয়ের মূল’ প্রবন্ধ ও শান্তিনিকেতনে ভাষণ ‘পাপের মার্জনা, মা মা হিংসীঃ, অমৃতস্য পুত্রাঃ’ দ্রঃ) , অন্যদিকে তেমনি সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারে লালিত ভারতীয় সমাজের বিমূঢ়তার বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানার জন্য তরুণদের উদ্‌বুদ্ধ করতে চাইলেন। এরই ফলে দেখা গেল শঙ্খ, ঝড়ের খেয়া, নববর্ষ উপলক্ষ্য করে যুবকদের সংগ্রামী হওয়ার প্রেরণা দিচ্ছেন, জানাচ্ছেন, ‘পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ/ .....এই তোর রুদ্রের প্রসাদ’ – প্রভৃতি উৎসাহবাণী। একই সঙ্গে লেখা ‘ফাল্‌গুনী নাটকে কবি প্রতিপন্ন করলেন যে যৌবন অর্থাৎ নবীনতাই সত্য এবং জরা অর্থাৎ পুরাতন অসত্য, কারণ সৃষ্টির মধ্যেই প্রতি ঋতুতে পুরাতনকে হারিয়ে দিয়ে নোতুনের লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। যুদ্ধের প্রতিঘাতে নারী-মুক্তি সম্বন্ধেও কবি সচেতন হলেন। গল্পে এবিষয়ে পথ দেখালেন স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, বোষ্টমী প্রভৃতিতে, কবিতায় দেখালেন মঞ্জুলিকা এবং বিনুর বিবেকী নারীত্ব, আর কিছু পরেই ‘মহুয়া’য় দেখালেন ধর্ম ও প্রথাচালিত সংকীর্ণ সমাজের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নারীর

প্রতিবাদ- আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশাঙ্কিনী। বস্তুত বলাকা থেকে মহুয়া এবং তাসের দেশ নাটক প্রথায় জীর্ণ, স্বার্থনিমগ্ন, ধনলোভী ও কর্মকুণ্ঠ সমাজের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিঘাতের চিহ্ন বহন করছে। কবি তাঁর পূর্ব-জীবনের প্রেম-কল্পনা থেকে কতদূর সরে এসেছেন তা মহুয়া কাব্যের 'দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে' অর্থাৎ সংগ্রামী ভূমিকায় এবং 'আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়ির না ধরণীতে' প্রভৃতির মধ্যে, এমনকি প্রণয়-সহায়ক বসন্তকেও ভাঙনের দূত, যোদ্ধা প্রভৃতি রূপে চিহ্নিত করার মধ্যে স্পষ্ট। ষাটোত্তর, এমনকি, পঞ্চাশোত্তর কোনো কবি তাঁর পুরানো সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে নূতনের পথে, মুক্তিবাহী সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়াতে পারেন এমন দৃষ্টান্ত আমাদের কবি ছাড়া আর নেই। তবু তিনি ঘোরতর স্বাদেশিকই, কারণ, যাদের তিনি জাগাতে চেয়েছেন তারা সংস্কারের বন্ধনে জর্জরিত আমাদেরই সমাজের মানুষ। "শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদী" বলতে কবি অন্ধ জাতি- বর্ণ-সম্প্রদায়- ভেদ এবং আচারপ্রথার শৃঙ্খলকেই বুঝিয়েছেন এবং শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণেও জানিয়েছেন যে আমাদের সঞ্চিত পাপের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। গতিমুখর জীবনই হল প্রকৃত জীবন, এবং জীবনদানের দ্বারাই সেই নবজীবন আয়ত্ত হতে পারে, অন্য পথ নাই। এই গেল চলমান কবিজীবনেই পরবর্তী অধ্যায়।

তৃতীয় পর্যায়ে কবি চিত্তের পরিবর্তন ঘটল ১৯২০ সালের পর, পুনরায় ইংল্যাণ্ড আমেরিকা ঘুরে এসে নোতুনতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর। ভেদবুদ্ধি এবং আচার প্রথার সঙ্গে সংগ্রামের কথা তো রইলই, অধিকন্তু এর সঙ্গে যোগ দিলে যন্ত্রসহায় ধনতান্ত্রিক পথে মানুষ – নিস্পেষণের বিরুদ্ধে অভিযান, প্রায় আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ধারায়। সোভিয়েত বিপ্লবের আলোচনা- প্রত্যালোচনা ইয়োরোপ-ভ্রমণে তাঁর দৃষ্টিগোচর কর্ণগোচর হওয়াই সম্ভব। কবির এবাকার যাত্রায় ছোটো-ইংরেজ বড়ো-ইংরেজ বিষয়ে তাঁর পূর্ব ধারণা শিথিল হল। তিনি দেখলেন, যেখানে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের প্রশ্ন, সেখানে ইংরেজ কবি- মনীষীরাও জঘন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অক্ষম। কথাটি জালিয়ানওয়ালার হত্যাকাণ্ড কেন্দ্র করে। কবি নিজে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাবার পর প্রত্যাশা করেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের সদ্‌বুদ্ধি- সম্পন্ন মানুষ একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ-বাণীও উচ্চারণ করবেন। প্রত্যুত্তরে তাঁদের রুদ্ধবাক্ দেখলেন। এই হল এক কথা, আর এক দিক হল, আমেরিকায় ধনতন্ত্রের আয়োজনে উত্তরোত্তর মুনাফাবৃদ্ধির আগ্রহ কিভাবে মেহনতী মানুষকে দাসত্বের পথে চালিয়ে পর্যুদস্ত করেছে, তাই দেখে তিনি ধনতন্ত্রকে অভিশাপ দিতে দিতে ফিরে এলেন। এর ফলে পশ্চিমের যন্ত্র ও ধনতন্ত্রভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির উপর কবির তীব্র ঘৃণা জাগল এবং এরই অভিঘাতে মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটক পরপর রচনা করলেন, আর রথের রশি বা কালের

যাত্রা নাটকে দেখালেন, যে- মেহনতী মানুষকে এই ভাবে অবক্ষয়িত করা হচ্ছে, তাদের সক্রিয় সহযোগীটা না থাকলে রাষ্ট্র অচল হবে। 'মুক্তধারা' য ন্ত্রসহায় রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে, আর 'রক্তকরবী' যন্ত্রসহায়ে মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে লেখা, শ্রেণী-সংগ্রাম –ঘেঁষা নাটক। কিছু পরেকার লেখা 'তাসের দেশ' বরং এদেশের গতানুগতিক শাস্ত্র- প্রত্যয় চালিত জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচায়ক, আর কবি দেখিয়েছেন এ বিদ্রোহ করছেন নারীরাই। এই সময় থেকেই তিনি কৃষি-বিজ্ঞান গবেষণার ও সমাজ-সেবা শিক্ষার পত্তন করেছেন। জনশিক্ষা ও হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য উদ্‌বোধন করেছেন শিক্ষাসূত্রের। বৈদেশিক চিন্তার যোগে জড়ত্বমুক্তির স্বপ্ন দেখছেন 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করে। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় এদেশীয় মানুষ- নিগ্রহের ব্যবস্থা পশ্চিম থেকেও পাকা। কারণ, শ্রমিকদের হরতাল ও প্রতিবাদ ধনতন্ত্রকে খানিকটা খর্ব যদিও বা করা যায়, মান্ধাতার আমলের শাস্ত্র-প্রথার উপর গঠিত রক্তে গাঁথা জাতিবর্ণ-ভেদের সংস্কার সহজে অপসারিত হবার নয়। এ অপরাধ সমস্ত জাতটার মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট। রক্তকরবীর অল্প পরেই লেখা 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কবি এদেশীয় মুনাফাখোর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এই সময়ে লেখা নবীন, বসন্ত প্রভৃতি নিসর্গ- কল্পনার নাটকগুলির মধ্যেও জীবনের অগ্রগতির বিষয়ই সংকেতিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে কবিচিত্তের আর একটি প্রগতির লক্ষণ দেখা যায় আধুনিক বিজ্ঞান বরণে। মহাকাশ-বিজ্ঞান বিষয়ে চলমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে নূতন দৃষ্টিকোণের প্রসার ঘটতেই কবি বিজ্ঞানে পূর্ণ আস্থা সহকারে সমগ্র সৃষ্টিকে দেখলেন। নৈবেদ্য পরমাণু-বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দিলেন, উৎসর্গের কবিতায় নীহারিকা-তারকার আবির্ভাব দেখালেন, পূরবীর সাবিত্রী ও আহ্বান কবিতায় সূর্যের স্বরূপে আবিষ্ট হয়ে তার সঙ্গে কবি- অন্তরাত্মার যোগ স্থাপন করলেন এবং তিরিশোত্তর 'শেষ সপ্তকে'র রচনায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের ভিত্তিতে মহাকাশ ও পৃথিবীর পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখলেন। কবির এই বিজ্ঞান-বরণ থেকে প্রমাণিত হল যে তাঁর কল্পিত ঈশ্বর-সত্তা পৌরাণিক বৈদিক কোনো ব্যাপার নয়, একটা আইডিয়া মাত্র, যার সঠিক পরিচয় কবি কোন দিনই পাননি বলে 'শেষ লেখা'র একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কবি দেশে বুদ্ধির অন্ধতা দূর করার জন্য বিজ্ঞান-শিক্ষার উপর জোর দিতে বলেছেন। কবির এই বিজ্ঞান-বরণ থেকে আমাদের কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এইভাবে দেখা যায়, সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকে কবি রোম্যান্টিক নিসর্গ প্রণয়-কল্পনা নিয়ে বহু আশ্চর্য কবিতা-কাহিনী রচনায় কালক্ষেপ করলেও

সমাজ ও বাস্তব মানুষ সম্পর্কে প্রভূতভাবে সচেতন থেকে পুরানো দৃষ্টিকোণের আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন, আর অনুন্নত মানুষের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নকেই স্বাধীনতা পাওয়ার প্রাথমিক শর্ত বলে গণ্য করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়টি কবি, মনীষী ও কর্মীর মিলিত উদ্‌যোগের একটা আশ্চর্য অধ্যায়। আগেকার অধ্যায়ে তিনি আদর্শ জীবনের সন্ধানে প্রাচীন ভারতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে পরে ফিরে এসেছেন এবং নির্যাতিত হিন্দু-মুসলমান অতিদীন মানুষের মধ্যেই বাস্তব ভারতকে পেয়ে তার উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তাঁর কবি- কল্পনাও মানবিক আদর্শের পূর্তির জন্য আত্ম- উৎসর্গের বাণীবাহক হয়েছে। জীর্ণ-পুরাতনের স্বপ্ন না দেখে কঠোর বাস্তবে অগ্রগতিশীল হওয়ার উচ্ছ্বসিত আবেগে তাঁর এই সময়কার কাব্য কবিতা স্পন্দিত হয়েছে। এই সময়ে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের নূতনতর উদ্দীপনা। রবীন্দ্রনাথ এতে উৎসাহিত হয়নি, গঠনমূলক পথ নয় বলে এর সমালোচনা করলেন এবং নিরক্ষর শোষিত মানুষের সংগঠনের পথই একমাত্র উপায় বলে মন্তব্য করলেন। হিন্দু-মুসলিম মিলন রাজনীতির পথে সম্ভব নয়, হতে পারে সামাজিক আদান-প্রদানের সূত্রে, এই অভিমতও প্রকাশ করলেন। কুসংস্কার-জনিত শৃঙ্খলমুক্তির প্রয়োজনবোধ এবং একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির নিজস্বার্থে যুদ্ধ লাগিয়ে নরহত্যার আয়োজনের স্বরূপটি এ সময়ে তিনিই ধরেছেন, যদিও এই ভাবনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব প্রতিঘাত ঠিক পরের অধ্যায় অর্থাৎ মুক্তধারা, রক্তকরবী ও কালের যাত্রা নাট্যরচনার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে।

রবীন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায় রাষ্ট্রসহায় ধনতান্ত্রিক শোষকের গ্রাস থেকে মানুষের মুক্তির ভাবনায় বিশেষভাবে চিহ্নিত। এই অধ্যায়ে তিনি সুরুলে ও শ্রীনিকেতনে কৃষি ও মানুষ সংগঠনে বিশেষভাবে আত্ম নিয়োগ করছেন, বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষের উন্নতি বিষয়ে পরীক্ষা করছেন ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সমবায়প্রথায় ব্যাপক প্রয়োগ বিষয়ে ভাবছেন। ছাত্রদের সমাজসেবা শিক্ষার উদ্‌যোগ করছেন, সভা সমিতিতে দেশহিত বিষয়ে, বিশেষে পল্লীর দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছেন আর কবিতায় অবহেলিত মেহনতী মানুষের জীবনের চিত্র পরিবেশন করে তাদের জীবনের শরিক না হতে পারার জন্য একাধিক বার আক্ষেপ প্রকাশ করছেন। এই অধ্যায়েই তিনি হিতৈষীদের পরামর্শ লঙঘন করে ও ইংরেজ সরকারের সন্দেহকে অগ্রাহ্য করে মানুষের মুক্তি স্বচক্ষে দেখে আসার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শনে গেছেন। ফ্যাসিজমের নখদন্তবিকাশের পুনঃপুন প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও ইংরেজ অপশাসনের স্বরূপ তাদেরই সামনে পরিস্‌ফুট করে গেছেন। তিনি সোভিয়েতদের মানুষ – উন্নয়নের কার্যকলাপে বিস্মিত হয়ে স্বদেশের দুর্ভাগ্যের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং যে- গ্রামসংগঠন ও মানুষ- সংগঠনের অধ্যবসায়

তিনি তাঁর সীমিত শক্তিতে স্বদেশে চালু করেছিলেন, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় তার পূর্ণাঙ্গ উদ্‌যোগ দেখে যেমন অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেছেন তেমনি আক্ষেপ সহকারে ভেবেছেন যে, ভারতে কী হয়েছে আর কী হতে পারত! অনুন্নত মানুষ সংগঠনের প্রাথমিক কথা হল সর্বজনীন শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে শিক্ষা, দ্বিতীয় কথা হল- তাদের অথনৈতিক উন্নয়ন। ইংরেজ শাসনের অবস্থায় তখনকার দিনে ভারতে এসব হতে পারিনি এবং হওয়ার কথাও নয়, কিন্তু আজই বা কতদূর হয়েছে? সংঘবদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কি আজ ধনতান্ত্রিক রাষ্টনীতি সম্বল করে ভারতকে বরং পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না? সোভিয়েত নীতিতে একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পদের বিলোপ সাধনের বিষয়টি কবির পছন্দ হয়নি, তিনি এ জায়গায় সমবায়নীতির প্রয়োগ অনুমোদন করেছেন, কিন্তু একথা তো ঠিকই যে ধনের আস্ফালন ও মানুষ-শোষণের বিষয়ে তিনি বারংবার প্রবল ঘৃণাই জানিয়ে এসেছেন। তবু সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্নও থেকে যায়। কেবল সমবায়নীতি সার্থক হয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ- বাসনাকে নির্মূল করতে কি সক্ষম হবে, যদি সমবায় প্রভৃতিকে একটা সর্বতোব্যাপী সামাজিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত না করা যায়? বস্তুত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো পিছনে না থাকলে যেমন সামবায়িক চাষ, যৌথ খামার প্রভৃতি সাফল্য অর্জন করতে পারে না, তেমনি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও অবাধ ধনসঞ্চয় রোধ করা যায় না, আর এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তো আজকের ভারতেই রয়েছে। মৌল সমাজতান্ত্রিক নীতির দৃঢ়মূল আশ্রয় না থাকলে গণতন্ত্র কিভাবে স্বর্ণতন্ত্রের রূপ নিতে পারে আমরা তো তারই ভুক্তভোগী। যাই হোক, একেবারে শেষজীবনে কবি মানুষের অধিকারের জন্য যে বেদনার্ত হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সাধ্যমত পথও দেখিয়ে চলেছেন এটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এই সঙ্গে আরও লক্ষণীয় এই যে, শেষ জীবনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তিনি বরং আগের থেকে আরও সোচ্চার হয়েছেন। ফ্যাসিস্ট যুদ্ধের জঘন্য নৃশংসতা ও চীনের উপর জাপানের অন্যায় আক্রমণের বারংবার প্রতিবাদ এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সভ্যতাদর্পী ইংরেজের ভারত শোষণের স্বরূপ পরিস্‌ফুট করে যাওয়া তাঁকে একালের শ্রেষ্ঠ সমাজবাদী মহাপুরুষরূপে চিহ্নিত করবে। শেষ দশ বৎসরের রবীন্দ্রনাথ আর স্বতন্ত্র ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নন, কেবল রোম্যান্‌টিক স্বপ্নচারীও নন, স্বদেশ ও সমাজের সঙ্গে অভিন্ন এবং সেই সঙ্গে সংগ্রামীও। এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথকে কাব্যিকভাবে আর এক পা মাত্র এগিয়ে আসার অনুরোধ করতে পেরেছেন। সুকান্ত সঠিক উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই মহাকবি কল্পনার জগৎ থেকে ক্রমে অনিবার্যভাবে বাস্তব মানুষের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সংগ্রামী জীবনে প্রবল সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন অথচ, সেই সংগ্রামের ঠিক শরিক হতে পারেন নি। বলা বাহুল্য, এ আক্ষেপ শেষজীবনে স্বয়ং মহাকবিরও এবং কবিতায় তা বারংবার উচ্চারিত।

যাদের করেছ অপমান .....

দেখা যায়, মানুষের প্রচলিত জীবনের একটা দিকে রয়েছে তার পুরনো বিশ্বাস ও কল্পনা, অন্য দিকটায় রয়েছে বাস্তব জীবনে বাঁচা-বাড়া নিয়ে বংশপরম্পরায় অবাধে চলার আগ্রহ। একদিকে কেবল সংস্কারের আশ্রয়ে প রিবর্তনহীন চিরাচরিত সত্য বলে পূর্বতন উপলব্ধিগুলিকে নির্বিচারে মেনে নেওয়া, অন্যটায় প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে নিয়মনীতির সৃষ্টি করে যথাসম্ভব নির্ঝঞ্ঝাটে বৈষয়িক জীবন রক্ষা করা। এ দুয়ের কিছুটা ব্যবধানেই রয়েছে মানসিক সৃষ্টি-প্রবণতার বিষয়, যাকে বলা যায় সাহিত্য ও শিল্পকলা, জীবনের উক্ত দুই মনোধর্মের সঙ্গে যা কমবেশি সম্পর্ক রেখে চলে।

রবীন্দ্রনাথ খুব বড় সাহিত্যস্রষ্টা। একালের শ্রেষ্ঠ কবি। এটাই যদিচ তাঁর প্রাথমিক পরিচয় এবং এতেই তাঁর সমুচ্চতা, তবু এর কাছাকাছি আর একটা দিকও তাঁর রয়েছে, যেখানে তিনি মনীষী এবং বিশেষভাবে সমাজ-চিন্তক। মোগলপ্রশাসনের অবক্ষয় থেকে আরম্ভ করে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণ জীবনে ভোগদখলের হীনতা পরিব্যাপ্ত হতে আরম্ভ করে। উপরের স্তরের মুষ্টিমেয় কিছু লোক অল্পস্বল্প ক্ষমতা ও অর্থ করায়ত্ত করে মানুষ-নিগ্রহ করতে থাকে। ইংরেজ শাসন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর এই শ্রেণীর মানুষই সমাজে প্রাধান্য পায়। ইংরেজের সংস্রবে এসে ইংরেজি শিক্ষায় দীক্ষিত শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশ নূতনতর চিন্তায় ও সাহিত্য – ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সামন্ততান্ত্রিক পুরানো সংস্কারের জায়গায় বিবেক-বুদ্ধি – পরিচালিত নূতন সংস্কার গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন ঠিকই, কিন্তু তার প্রভাবে আলোকিত হয়েছিল জনসমাজের একটা সামান্য অংশ মাত্র। অপরপক্ষে অশিক্ষার অন্ধতা ও কুসংস্কার ছিল সর্বব্যাপী। আর এরই সঙ্গে যোগ দিয়েছিল দারিদ্র্য এবং একেবারে অবহেলিত শ্রেণীর অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার। এর একটা কারণ পরাধীনতা বলে মনে করা গেলেও আমাদেরই সুবিধাভোগী শ্রেণীবিশেষের জঘন্য স্বর্থপরতাই এর জন্য মূলে দায়ী ছিল। আবার মধ্যযুগের লোকশিক্ষার আয়োজন নষ্ট হওয়ায় দেশের হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ অন্ধভাবে ধর্মীয় আচার-পালনকেই জীবনের বড় কর্তব্য বলে মনে করতে থাকে এবং একে অন্যের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে। তথাকথিত ধর্মপালন নিয়ে এরকম হীনাবস্থা মধ্যযুগেও ছিল না। বরং পারস্পরিক মিলমিশই ছিল দুটো কারণেঃ (১) বহু ধর্মপ্রবক্তা আবির্ভূত হয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ভাবগত মিলনের বাণী প্রচার করতে থাকেন এবং (২) মোগল-পাঠান প্রশাসনে মুসলমান- পক্ষপাতীত্ব ছিল না, বরং সুলতানেরা হিন্দু কবি পণ্ডিতেরই পোষক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বৈদেশিক ইংরেজ শাসনের দোষত্রুটি বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন এবং অত্যাচারী ও শোষক ইংরেজের নির্মম সমালোচনা করেছেন, কিন্তু যে- যে ক্ষেত্রে মানুষের হীনাবস্থা আমারেরই সৃষ্ট, আমাদের অন্ধ কুসংস্কার বা শ্রেণীস্বার্থপরতা থেকে যেগুলির উদ্ভব, সেগুলি সহ্য করতে পারেন নি। কবিতায়, নাট্যে, প্রবন্ধে, ভাষণে, এমনকি স্বকীয় কর্ম- উদ্‌যোগের মধ্য দিয়েও সেসব দূর করার চেষ্টা করেছেন আজীবন। তিনি সর্বজনীন ও আদর্শ মানুষ গড়ার শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন, গ্রাম-সংগঠন ও সামবায়িক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিরক্ষর, নিরুপায় ও প্রায় পশু করে তোলা হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের উন্নয়নের পথ দেখিয়েছিলেন, আর হিন্দুর জাতিবর্ণবিভেদ ও মুসলমানদের কেবল মুসলমান বলেই ঘৃণা করার জঘন্যতার বিরুদ্ধে লেখনীমুখে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন অবিরত।

আজ তো আর পরাধীনতা নেই, কোনো কিছু ঘটলেই কেবল ইংরেজের উপরই দোষারোপ করে কর্তব্য সাঙ্গ করার উপায় নেই। আজকের এই অপ্রত্যাশিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সূত্র যে আমাদেরই অবুদ্ধি এবং দুর্বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়ে এর মূল ধরে টান দিতে হবে। যা আগে সম্ভবপর হয়নি এবং সেই ১৯০৭ সাল থেকে ক্রমশ ঘনীভূত হতে থেকে দেশবিভাগরূপ মৌল অভিশাপের কারণ হয়েছে, সব শক্তি দিয়ে তা থেকে দেশকে পরিত্রাণ না করতে পারলে সমূহ বিপদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা নিয়ে লিখনে এবং ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যে পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন তার তাৎপর্য আজও বাস্তব রয়ে গেছে বলে মনে করা যায়।

সুতরাং রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে পল্লবিত বাগ্‌জাল বিস্তার করলে কোনো লাভ হবে না। সামাজিক মিলনই হবে যথার্থ মিলন এবং তা ঘটলে তবেই সংশয় দূর হবে, তবেই বন্ধন মৌখিক ও ক্ষণস্থায়ী না হয়ে পাকা হবে। আন্তরিক বোঝাপড়া অনায়াসে এসে যাবে বাস্তব আদানপ্রদান সম্পর্কের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ এই বিভেদকে জাতীয় অভিশাপ রূপে দেখেছেন এবং এর বিসদৃশতাকে তুলে ধরেছেন এই বলে যে, একই বাসভূমিতে একই গ্রামে পাশাপাশি বাস করব অথচ একত্র ওঠাবসা পানাহার করব না এ এক হাস্যকর অসংগতি। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক মিল নেই বলেই খিলাফতের মধ্যস্থতায় কেবল রাজনৈতিক কোলাকুলি স্থায়ী ফল দেয় নি, এই সামাজিক সম্পর্কহীনতা আছে বলেই ঘুরে –ফিরে কারণে – অকারণে আজ এখানে কাল ওখানে দাঙ্গা বাধছে। একই সঙ্গে মনীষী কবি লক্ষ্য করেছেন যে, ধর্মীয় গোঁড়ামি দু'পক্ষে থাকলেও আধুনিক শিক্ষায় অনগ্রসর হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে তা বিশেষভাবে খুঁটি গেড়ে বসে আছে। আবার হিন্দুদের ধর্মবোধ কেবল আচার-পালনের মধ্যেই

নিঃশেষ। ছোঁয়াছুয়ির নিয়মপালন এবং গোবর গঙ্গাজলই তার ধর্মের এখনকার রক্ষক।

রবীন্দ্রনাথ আরও দেখেছিলেন যে, বৈষয়িক জীবনে হিন্দু-মুসলমান সমকক্ষতার অভাব মুসলমানদের হিন্দু-বিদ্বেষের কারণ হয়েছে। বাঙলায় হিন্দুর নিরক্ষরতা থেকে মুসলমানের নিরক্ষরতা অনেক বেশি এবং পদমর্যাদাতেও মুসলমান হিন্দুদের থেকে বহু নিম্নে। এরকম বৈষম্য বিদ্বেষ জন্মানোর আরও একটা কারণ। ফলে পদে মানে মুসলমানেরা হিন্দুর সমকক্ষ হোক, এই কামনা করে তিনি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি এ-ও দেখেছিল যে, মধ্যযুগে মানুষে মানুষে ভিন্নতাবোধের একটা প্রতিঘাত এসেছিল সূফীধর্ম ও ভক্তিধর্মের মিশ্রণে ও বিস্তারে। নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য এবং দাদু, রজ্জব, রবিদাস প্রমুখ সহজসাধকেরা প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাতে বেশ ফল হয়েছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মের অধিকার পেয়ে অন্তত নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতে পেরেছিল। একই সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধিকার যুক্ত হলে সোনায় সোহাগা হতে পারত। তবু মন্দের ভালো যে, কিছুকালের জন্য মানুষ-ঘৃণা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। পাঠান-মোগল প্রশাসনে এই সব সাম্যমূলক নোতুন ভাবধর্মের নানাভাবে সপক্ষতা করা হয়েছিল। বিভ্রাট বেধে উঠল মোগলক্ষমতা হ্রাস হওয়ার পর হিন্দু শাক্ততন্ত্রের অভ্যুদয়ে। ইংরেজশাসন হিন্দু বা মুসলমানের পালিত ধর্মীয় আচার- আচরণের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, কারণ এতে তার ব্যবসায়িক ও সাম্রাজিক স্বার্থের ক্ষতি। এই অবসরে প্রথম দিকে মুসলমানেরা ইংরেজ-বিরোধী ছিলেন, ইংরেজ আয়োজিত শিক্ষা তাঁরা ঘৃণায় উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁদের মক্তব-মাদ্রাসায় কোরান এবং হাদীসকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। ফলে ইংরেজের নয়া প্রশাসন ব্যবস্থায় তাঁদের কোনো স্থানই ছিল না। এই অবস্থা শোধরাতে সময় লেগেছে। কিন্তু বিস্তৃত জনশিক্ষার অভাবে যেমন হিন্দু, তেমনি মুসলমান গোঁড়ামিতেই ডুবে থেকেছে।

রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধতা রোধের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষার বিস্তারকেই প্রাথমিক অস্ত্ররূপে গণনা করেছেন। সোভিয়েত পরিভ্রমণ করে আসার পরে তাঁর এ-বিষয়ে সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হয়েছে। জনশিক্ষা এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক গ্রাম- সংগঠন, যার মধ্যস্থতায় কার্যগতিকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের স্বপ্নও রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তার পূর্ণতা আজও ঘটলো না। স্বাধীনতার পরই দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনবোধের

সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম পরিস্থিতি ও জাতিবর্ণভেদ দূর করার বাস্তব আয়োজন গৃহীত হলে আজ আমরা অনেকটা সমাধানের পথ দেখতে পেতাম।

তা তো হলই না, পরন্তু ভারত- শাসনে হিন্দু ধনিকগোষ্ঠীর পরোক্ষ প্রভুত্ব বিস্তারের ফলে উদ্‌ভূত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সাধারণ মানুষকে প্রত্যাশিত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে এবং শুধু বঞ্চিতই করে নি, গত চল্লিশ- পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তাঁদের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থায় পৌঁছে দিচ্ছে। পাঞ্জাবে, আসামে, কাশ্মীরে যা চলছে, অযোধ্যায় সূত্রে যে গুরুতর ব্যাপার ঘটল তার প্রতি দেশের বুদ্ধিজীবীরা তথ্য ব্যাপক শিক্ষিত মানুষ আজ আর উদাসীন নেই। ধর্ম নিয়ে গোঁড়াদের সাম্প্রদায়িক কলহ রাজনীতি –পুষ্ট হয়ে আগেকার থেকেও কদর্যতা নিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের মুষ্টিমেয় একাংশের গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে ও সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আড়াআড়িতে নেমে পড়েছে। দুই পক্ষই পাল্লা দিয়ে যদিচ গায়ের জোর দেখানোতে ও দাবির অযৌক্তিক ছেলেমানুষিতে মেতে উঠেছে, তবু অসংগত আবদার হিন্দুপক্ষেই বর্তমানে সমধিক। পুনে, আমেদাবাদ নাগপুর, বাঙ্গালুর, ভূপাল প্রভৃতি স্থানের ঘটনাবলী আমাদের এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

এমন অবস্থায় দেশের বিবেকী লেখক শিল্পী ও চিন্তাশীল মানুষদের দায়ীত্বও কম নয়। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক জাতিভেদ এবং রাজনৈতিক চক্রে সদ্য-আবির্ভূত সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ বিষয়ে লেখনীমুখে বহু শ্রম স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই বহুজাতিক দেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের একটি আশ্চর্য ইতিবাচক ঐতিহ্যই বিদ্যমান। বিরোধকে সমন্বিত করে এগিয়ে চলাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। সুতরাং আজকের গণতন্ত্রকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার-করা ফ্যাসিস্ট শয়তানদের চক্রান্ত শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বিচারে দেখা যায়, ভেদবুদ্ধি সহ মানুষঘৃণ্য হিন্দুসমাজে যতদূর প্রবল, মুসলিম সমাজে তেমন নয়। মুসলমানদের মধ্যে মর্যাদার বৈষম্য আর্থনীতিক এবং তা আধুনিক। হিন্দুসমাজে বিগত আড়াই-তিন হাজার বছর ধরে ক্রমান্বয়ে পরিপুষ্ট। প্রথমে চতুর্বর্ণ, পরে আট-দশ বর্ণ এবং পরিশেষে বর্ণ ছেড়ে জন্ম অনুসারী জা'ত ভেদে ছত্রিশ- চল্লিশ, আর সেই সঙ্গে জা'তের ক্রম ধরে উত্তরোত্তর বর্ধিত মানুষ-ঘৃণা। আধুনিক শিক্ষাতেও এর জড় যে যাচ্ছে না তার মূল কারণ ঐ একটাই-হীনতর জা'তের শোষণের দ্বারা সুবিধাভোগ। যে-কারণে সম্প্রতি প্রস্তাবিত অনুন্নত

সম্প্রদায়ের জন্য চাকরি-সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিবাদে উচ্চবর্ণের আন্দোলন। অযোধ্যার ঘটনাতেও এটা প্রমাণিত যে রামভক্তি উপলক্ষ্য করে মুসলমান হটানোই উক্ত সুবিধাভোগীদের লক্ষ্য। প্রথম মধ্যযুগের রামভক্তি-কৃষ্ণভক্তিতে মুসলমানেরা বিব্রত তো হয়ই নাই, বরং অভিভূত হয়ে যোগও দিয়েছিল, তার সাহিত্যিক প্রমাণ যথেষ্ট। আর, লাঞ্ছিত বঞ্চিত পশূকৃত নিম্নবর্ণ হিন্দুরাই যে তখন সূফীধর্মের মধ্যস্থতায় ইসলাম বরণ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে তারও প্রমাণ রয়েছে। রবীন্দ্র-অধ্যয়নে কী জাতপাঁত কী হিন্দু-মুসলমান বিভেদ দূর করতে হলে কেবল পোলিটিক্যাল্ ভাই ভাই সম্বোধনে তা হবে না, পুরোপুরি সামাজিক মিলন চাই। তাঁর গ্রাম-সংগঠনের মধ্য দিয়ে এ বিষয়েও একটা গোড়াপত্তনের প্রয়াস তিনি নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি নানা কারণে, তবু একটা আদর্শ থেকেই গেছে। আর অপমানিত মানুষকে কাছে টানতে গেলে কেবল ভাষণের দ্বারা তা সম্ভব হবে না, ঘনিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন এবং একসঙ্গে ওঠাবসার দ্বারাই তা হতে পারে, এতে সন্দেহ কী?

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

এ নির্ঝর কবির সঙ্গে মুক্তিপ্রেমী বাঙালী- চিত্তেরও। মধ্যযুগীয় সংস্কারের পাষাণ- গুহায় এ ছিল অবরুদ্ধ। উনিশ শতকীয় বুর্জোয়া জাগারণের কোলাহলের মধ্যে এর অস্‌ফুট অনির্দিষ্ট বিক্রিয়া। রবির স্বপ্রকাশের সঙ্গে এর প্রথম আলোকদর্শন এবং তার পর থেকে পাষাণ-অবরোধ চূর্ণ করার দুর্বার আবেগ। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীস্বার্থের গ্র্যানাইট, অন্যদিকে নবজাত ধনতান্ত্রিক পাললিক শিলাপ্রচয়ের সমুদ্‌ঘাত। আলোকের দূত মহাকবি এ দুয়ের নিষ্পেষণকেই আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ভেঙেছেন। আমরা তাঁরই পথের অনুযাত্রিক। কবির অনুভব থেকেই আমরা জানি যে- 'পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ'। কবির স্থির প্রত্যয় আমরা ভুলি না-

কোথা মৃত্যু, অন্যায়র কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল তোল শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

পথনির্দেশ দিতে দিতে, কবি, তুমি এগিয়ে গেছ মানব-অভ্যুদয়ের সীমান্তে, নিসর্গের রম্যতাকে বরণ করেও তা পিছনে ফেলে রেখে মহামানব- সম্মিলনের দিকে পদক্ষেপ করেছ, ভাবী দিনের ঘোষণা দিয়েছ-ঐ মহামানব আসে। যখনই তুমি লৌকিকভাবে আমাদেরই মত দেবতাকে ডেকেছ, তখন দেবতা আসেনি, এসে দাঁড়িয়েছে প্রত্যক্ষ মানুষ- দাসত্বের ভারে ন্যুব্জ, উপবাসে ক্ষীণ, ভাষাহীন, তৃণাদপি নম্র এক একটি প্রাণী। তার পরই বেজেছে তোমার রুদ্রকণ্ঠের আহ্বান- ওরে তুই ওঠ্ আজি, আগুন লেগেছে কোথা! এবং

কিসের বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ,
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে।

'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা'- কিন্তু সে কি কেবল চীন, আফ্রিকা ও স্বদেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধেই? প্রশ্নের জবাব তুমি নিজেই দিয়েছ- আমাদের প্রাথমিক লড়াই ভূতের সঙ্গে। সামন্ততান্ত্রিক জা'তবর্ণ সংস্কারের অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের নিজেদেরই সঙ্গে। আত্মসংগঠন হলে, হিন্দুমুসলমান কর্মসূত্রে ও সামাজিক সূত্রে মিলিত হ'লে তার শক্তির চাপে বাইরের ভূতটা আপনা থেকেই সরে পড়বে। আজ বাইরের ভূতটা পালিয়েছে, সরে পড়েছে আমাদের

অঙ্গচ্ছেদ করে, এমনভাবে যাতে তার অশরীরী প্রভাব থেকেই যায়। বস্তুত তা থেকে গেছে এবং তাই শুধু নয়, প্রত্যক্ষ নখদন্ত বিকাশ আরম্ভ করেছে। এক্ষেত্রেও কিন্তু, কবি, তোমার পথনির্দেশ রয়েছে, তা হোল – মাতৃভাষায় সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তার ও পঞ্চায়েত –নির্ভর গ্রাম-সংগঠন, সমবায় ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার, আর বিভেদ বিচ্ছিন্নতাবোধের বিরুদ্ধে সঙঘবদ্ধ প্রতিরোধ। গ্রামীণ মানুষের সংগঠনই যে আসল শক্তি তা তোমার কাছ থেকেই আমরা জেনেছি। আমরা নিশিদিন ভরসা রাখছি, আর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের যে প্রেরণা পাচ্ছি সে তোমার দেওয়া উৎসাহ থেকেই।

রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নন, মহাকবি। সমাজ ও জীবনের অনুষঙ্গ না থাকলে কেবল আকাশচারী কল্পনার রম্যতা পরিবেশন করেই মহাকবি হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশেষ এই যে, তিনি যেমন নিসর্গ- কল্পনার চূড়ান্ত করেছেন, তেমনি সমাজ-ভাবনারও আশ্চর্য স্বাক্ষর রেখেছেন। আর তাঁর সমাজ-অনুষঙ্গ যেমন শাস্ত্র- প্রথার দোহাই দিয়ে অগণিত মানুষের শোষণের ক্ষেত্রে তেমনি সম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্রেও বিদ্রোহের রূপ নিয়ে স্ফুরিত হয়েছে। তাঁর জীবৎকালের মধ্যে কী স্বদেশে কী বিদেশে অন্যায় আচরণ ও মানুষ-নিগ্রহের যাবতীয় মুখ্য ঘটনাবলীর তিনি প্রতিবাদ করেছেন, যুদ্ধবাজদের তীব্র কশাঘাত হেনেছেন, সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন বারংবার, আবার নোতুন সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি বিনিযোগ করেছেন।

কবি, মনীষী ও সেই সঙ্গে কর্মীর এক আধারে এই সম্মিলনের দৃষ্টান্ত বিশেষ আর দেখা যায় না। কিন্তু তবু তাঁর কিছু সমীক্ষকের দল- কবি ঈশ্বর- নির্ভর, কবি উপনিষদের অনুকারী প্রভৃতি আখ্যায় তাঁর নিন্দা করেছেন। হয় তাঁরা তাঁর সামগ্রিক পরিচয় নিতে অক্ষম ছিলেন, নয় সব বুঝেও তাঁরা তাঁর যথার্থ ব্যক্তিত্বকে লোকচোখের অগোচরে রাখতে চেয়েছেন। কারণ, আদ্যন্ত প্রসারিত এবং উত্তরোত্তর প্রবর্ধিত তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সমাজ-সত্তা তো সামান্য পাঠকেরও চোখের বাইরে থাকা সম্ভব নয়। তাঁর শতাধিক প্রবন্ধের দিকে নাই চোখ গেল, 'এবার ফিরাও মোরে' ও 'ঐকতান'- এর মতো কবিতার কী হোল, কী হোল বলাকার শঙ্খ, ঝড়ের খেয়া, নববর্ষের আশীর্বাদের মতো কবিতার, কীই বা হলো গীতাঞ্জলির 'অপমান', কল্পনার 'হতভাগ্যের গান' ও 'বর্ষশেষ' কবিতায়, 'সুপ্রভাত' এবং এরকম আরও অনেক কবিতার? এককালে বিপ্লবী স্বাদেশিকদের এসব মুখে মুখে ফিরত, আর সমীক্ষকদের এদিকে নজরই গেল না! না কি বুর্জোয়া চরিত্রে এরকম হয়েই থাকে? তা না হলে, যেখানে কবি নিজে বলছেন এবং একাধিক বারই বলছেন যে-

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য,
পাপেরে দেখেছি নানা ছলে,
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি
জীবনের স্রোতে পলে পলে।

আর সেই সঙ্গে যাত্রীদের সংগ্রামে উৎসাহিত করেছেন সামাজিক দুঃখের কথা তুলে-

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা,
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ-
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

সেখানে কবি কেবল ঈশ্বরদর্শী এমন ধারণার উদয় হয়েছিল কিভাবে?

নারীকুলের অবরুদ্ধতার দিক কবি দেখালেন পলাতকায়, আর বিদ্রোহের ছবি দেখালেন মহুয়ায় ও গল্প –কাহিনীতে। অথচ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সমালোচক সিদ্ধান্ত করলেন যে, রবীন্দ্রনাথ দুঃখ ও অমঙ্গলের ছবিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, কারণ , তিনি চিরশান্তি ও ঈশ্বর- নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত কবি! হায়রে, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কী বস্তু তাও তাঁরা বিচার করে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না! করলে নিশ্চয়ই দেখতেন- তা নিসর্গ-আশ্রিত সুন্দর, সমাজ- আশ্রিত মহাকাল বা ইতিহাস- বিধাতা, বিজ্ঞান – আশ্রিত শিব, রুদ্র, নটরাজ। সবই আদ্যন্ত কবি- কল্পিত। রবীন্দ্রনাথ নিজে বারংবার জানিয়েছেন যে, সৃষ্টির নিয়ামক কোনো স্থির স ত্তার পরিচয় কোনো দিনই তিনি পাননি, কারণ তা পাওয়া যায় না। আর, তাঁর দেবতার ক্ষেত্র হল অভিযাত্রী মানুষের মধ্যে, পুষ্পখচিত বনস্থলীতে, ‘দোসর জনার মিলন-বিরহের গহন বেদনায়’। আবার, ‘তিনি গেছেন যেথায় মাটি কেটে করছে, চাষা চাষ’। কল্পিত ভগবান আর তাঁর কল্পিতদূতের অহিসংমন্ত্রে কবির সংশয়ও জেগেছে অন্যায় অত্যাচার দৃষ্টে, যেমন হিজলী জেলে বন্দী-হত্যায়, জালিয়ানওয়ালার নৃশংস জান্তব কাণ্ডে।

‘আজ দুর্দিনে ফিরানু তাদের
ব্যর্থ নমস্কারে’

অচলায়তন নাটকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণ ও ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ঘোষণায় কোনো ঈশ্বরতত্ত্ব আনেননি, রক্তকরবীর শ্রমিক-বিপ্লবেও নয়,

মুক্তধারা, রথযাত্রা, তাসের দেশ কোথাও নয়। তাঁর গ্রাম-সংগঠনে অথবা বিশ্বভারতীর শিক্ষা সূত্রে তিনি ঈশ্বরের বা দৈবের মুখ চেয়ে ছিলেন? কারারুদ্ধ এক পিতার দুই সন্তান ও সেই সঙ্গে আশ্রমের ছাত্রের মুখ দেখে কবি কি বলেন নি যে, তথাকথিত শুভবিধানের উপর তাঁর আর আস্থা নেই। আর সোভিয়েতে মানুষের মুক্তি দেখে যে অপার বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন কবি, তাতে তিনি কি ঈশ্বরের জয়গান করেছিলেন? 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বেদ-উপনিষদ থেকে লাইন তুলে খুশিমতো ব্যাখ্যা করে একথা কি প্রমাণ করেন নি যে, মানুষই শেষ সত্য- তার উপর আর নেই? কথা এই যে, এই মহাকবিকে খাপছাড়া ভাবে দেখে এবং একটা মনঃকল্পিত সমাধান গড়ে তুলে বই খাড়া করার মোহবশে যা যা লেখা হয়, তার বহু বিরোধী ভাবনাই আমরা কবির লেখায় প্রায়শ দেখতে পাই। ঐরকম মোহ এবং মনঃকল্পিত দর্শন থেকে রবীন্দ্ররচনা –প্রবাহের মুক্তি ইদানীং দেখা যাচ্ছে এটা অবশ্য একটা আশায় কথা।

আরও এক প্রচার, যে, কবি খুব অহিংসার ভক্ত ছিলেন। অথচ আমরা দেখেছি কবি কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস করতে আমাদের শেখান নি এবং শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্তিও তিনি বিহিত করেছেন। "হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা," ভীরুতা এবং জড়তার তিনি অতি প্রবল শত্রু এবং সংগ্রামে মৃত্যুবরণ ছাড়া মহান্ মুক্তি কোনো মতেই আসতে পারে না, এই তাঁর সিদ্ধান্ত। কবির এই বিশ্বাস এবং সেইমতো প্রেরণা সঞ্চার করার মর্যাদা যেন আমরা রক্ষা করতে পারি। বলা বাহুল্য, কবি-শিষ্য নজরুল এবং সুকান্তও আপোসহীন সংগ্রামেরই বিজয়বার্তা ঘোষণা করে গেছেন। এই নোতুন শতাব্দে তাঁকে সঠিকভাবে জানার আগ্রহ যেন দুর্লভ না হয়।

নিসর্গ থেকে মানুষের দ্বারে

সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার প্রারম্ভ হিসাবে মোটামুটি ১৮৮০-৮১ খ্রীঃকে ধরা যেতে পারে। এখন থেকে ১৯৪০-৪১ পর্যন্ত ষাট বছরের মধ্যে কবির স্বদেশে এবং বাইরে এত বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত জেগেছে, সাহিত্যে ও দর্শনে-বিজ্ঞানে এত সব অভিনব মতামত বের হয়েছে যা পূর্বেকার কোনো একটি শতাব্দীতেও ঘটে নি। ব্যক্তিগত জীবনেও কবিকে পরিবর্তনের সম্মুখীন কম হতে হয় নি। বলাই বাহুল্য, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ মৌল রোম্যান্টিক কল্পনা ও আদর্শের অধীন হলেও স্বদেশ ও বিদেশ থেকে পাওয়া সামাজিক অভিঘাত তাঁর কাব্যের বিষয়ে ও রূপরসে বারংবার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তারই মধ্যে ব্যক্তিগত ঘটনাও স্থানে স্থানে কিছু স্বাক্ষর রেখেছে অবশ্য। তবে তার পরিমাণ নগণ্য। কবির জীবৎকালে এই অভিঘাতের বিষয়গুলি তেমন চিন্তিত হয়নি বলে এবং রবীন্দ্রকৃতির সামগ্রিক চিত্র সমীক্ষকদের সামনে ছিল না বলে আংশিকভাবে তাঁকে দেখা হয়েছিল। আর তাতে আলোচকদের স্বকপোল-কল্পিত ধারণা- ভাবনার অবকাশও ঘটেছিল প্রচুর। সে কুহেলিকার প্রভাব ১৯৪০ পর্যন্ত এমনভাবেই ছিল যাতে সাম্যবাদী প্রগতিপক্ষও পূর্ব – ধারণায় আবিষ্ট হয়ে কবিকে হস্তীদন্ত-খচিত মিনারবাসী বলে অভিযুক্ত করেছিল। দৃষ্টিকোণের আবিলতা কেটে যাওয়ার পর ক্রমে দেখা গেল এ কবির কল্পনা সমাজ ও জীবন ত্যাগ করে সুদূরস্পর্শী সব ক্ষেত্রেই হয়নি, তবে কখনও কল্পনায়-সংকেতে মিশিয়ে কখনও বা স্পষ্টভাবেই ঐ সমাজ- অভিঘাত ব্যক্ত হয়েছে এইমাত্র। অবশ্য সেই সংকেতটুকু ধরার শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে।

দেশ-কাল – অভিঘাতের ফলে কবির নিসর্গ- কল্পনা কিভাবে সমাজ- কল্পনার রূপ নিয়েছে সে বিষয়ে একটা তুলনা দিতে বাধা নেই। বসন্তের বর্ণনা- ১৪০০ সাল কবিতা – রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেত্রিশ- চৌত্রিশ-

নবীন ফাল্‌গুন্- দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর-
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু- গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে।

একই বসন্ত, একই ফাল্‌গুন। কিন্তু এর আবার চৌত্রিশ বৎসর পরে কবিচিত্তে সে বসন্তের ক্রিয়াকলাপ দেখুন-

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা!
দস্যুর মতো ভেঙে চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা! .....
বলো জয় জয়, বলো নাহি ভয়
কালের প্রয়াণ –পথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে। (বোধন, মহুয়া)

সত্যই তাই, কালের প্রয়াণপথেই কবি-অনুভবে বসন্ত এবং যৌবনের এই রূপান্তর ঘটেছে। আরও মনে করা যাক, রবির চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে লেখা প্রেমের কবিতা, যেমন, যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী, অথবা, তুমি সন্ধ্যার মেঘ- মম বিজন-জীবন-বিহারী। এগুলির সঙ্গে একান্ত বিপরীতে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে-

আমরা দু'জনা স্বর্গ- খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রু- গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে। (মহুয়া)

পুনরায় দেখা যাক বছর তিরিশের লেখা অর্জুন বা দেবযানীর প্রণয়-কথা এবং তার সঙ্গে প্রতি-তুলনা করা যাক সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও অভিসারিকা, অথবা শ্যামলী-কাব্যের 'মিলভাঙা' অথবা অমিয়ার প্রণয়, অথবা চণ্ডালিকার কাহিনী। পরিবর্তন গুরুতর। এরকম আরও নানান্‌ ক্ষেত্রে। স্বদেশিকতার ধারণায়, শিক্ষা বিষয়ে ধারণায়, সংগীতে, নৃত্যে, ছন্দে কালোচিত অভিজ্ঞতা অনুসারে কবি পরিবর্তিত হতে হতেই চলেছেন। এসবের মধ্যে কেবল একটি অধ্যায় দেখলে কবিকে ঠিক চেনা দুষ্কর হবে। ব্রাহ্মসমাজের জন্যই হোক বা পিতৃতর্পণের জন্যই হোক কবিকে কিছু ঈশ্বরভক্তির গান বা তার সঙ্গে মিলিয়ে আদর্শ-ভাবনার কিছু কবিতা লিখতে হয়েছে। উপনিষদ অনুবাদ করতে হয়েছে, উপাসনা- মন্দিরে বসে কিছু ভাষণও দিতে হয়েছে, নিজ-জীবনে পথ-পরিবর্তনের অভিঘাতে নিজ 'অন্তর-দেবতা'

অর্থাৎ চালক কোনো শক্তির কাব্যিক কল্পনা করতে হয়েছে, সেই সঙ্গে নৈবেদ্য গীতাঞ্জলি নাম দিয়ে বেশ কিছু স্বদেশ-ভাবনা ও নিসর্গ-ভাবনার কবিতাও তিনি লিখেছেন- এসব লক্ষ্য করে যাঁরা তাঁকে ঈশ্বরদর্শী ঋষি বলে মনে করেছিলেন তাঁরা দেখেও দেখতে পাননি যে আসলে তিনি কবি। "আমি সাধকও নই, গুরুও নই।" "অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি নিতে হল তুলে" "নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে"। আর শেষজীবনের, প্রায় শেষ মুহূর্তের স্বাক্ষর- 'কে তুমি। পেল না উত্তর'। কেউ হয়ত প্রতিবাদ জানাবেন যে তাহলে উৎসর্গ-নৈবেদ্যের বিশ্বদেব, ব্রহ্মসংগীত ও গীতাঞ্জলির প্রভু, নাথ- এসব কি কথার কথা মাত্র? আমরা বলব হাঁ, কতকগুলি আমাদেরই মত লৌকিক ধারণার উপর কল্পনার বিস্তার, কতকগুলি পরিস্ফুট নিসর্গ-কল্পনা, কতকগুলি বা মহাকাশ-বিজ্ঞানের বিস্ময় থেকে শিব, রুদ্র, নটরাজ কল্পনা। "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার" থেকে একথা কি মনে করা যাবে যে বাতাসের গর্জনে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই গর্জন শোনা যাচ্ছে, অথবা 'শ্রাবণ –ঘন –গহন মোহে' উদাসীন পথিকরূপে যে পথ চলছে সে ভগবান? কাউকে একটা উপলক্ষ্য করে মনের কথা ব্যক্ত করতে, অথবা অতিমাত্রায় আনন্দ-বিস্ময় থেকে 'সুন্দর হে সুন্দর', ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' অথবা 'শরতে আজ কোন্ অতিথি' এরকম কল্পনাই করতে হয় । কেন এরকম হয় তা কবিই সঠিক ধরতে পারেন না, ফলে অজানা, অরূপ, নটরাজ, মহাকাল, ইতিহাস-বিধাতা এরকম কল্পনা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। অন্তত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটাই রীতি। সামাজিক পরিবর্তন আনতে যিনি বিপ্লবের কথা বারংবার বলতে পারেন, অদৃষ্টের দিকে না তাকিয়ে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার প্রেরণায় যিনি আমাদের নোতুন জাতীয় চৈতন্য তৈরি করেছেন, যে কবি বলেছেন যে দেবতাকে পাইনি, মানুষকে পেয়েছি তার জায়গায়, যে কবির আধুনিক বিজ্ঞানে এত গভীর আস্থা, যে কবি বারংবার সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের বিনিপাত ঘোষণা করেছেন এবং তার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকছেন না, তাঁকে ঈশ্বরবাদী বলে মনে করা তাঁর অবমাননা। বস্তুতঃ কাল্পনিক নিসর্গ–সৌন্দর্য এবং প্রখর সমাজবোধ এই দুই প্রান্তিকতার মধ্যে কবি আসা যাওয়া করেছেন তাঁর কাব্যজীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। আর, প্রায় গাণিতিক পরিমাপ করে একথা বলা যায় যে, সমধিক পরিমাণ নিসর্গ-ধ্যান আর কিছু মানুষ-ভাবনা নিয়ে তিনি কাব্যজীবন যদিচ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষার্ধ সম্পূর্ণ ব্যয় করেছেন মানুষ-দর্শনে, সমাজ-দর্শনে । ঐ সময়কার প্রকৃতিচিত্রে সাংকেতিকভাবে সমাজ ভাঙার উৎসাহ পরিস্ফুট ও ঘনীভূত হয়েছে, কিন্তু তার পূর্বেও মানবমুখীনতার দৃষ্টান্ত রয়েছে যথেষ্ট। তাঁর ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে লেখা গদ্য প্রবন্ধগুলি অথবা প ল্লী- সংগঠন বা হিন্দু-মুসলমান সামাজিক মিলনের আত্যন্তিক প্রয়োজনের বিষয়ে পুনঃপুন লেখা অমূল্য প্রবন্ধ ও ভাষণের বিষয়ও এখন ধরছি না। নিসর্গ-মূলক কল্পনার অসামান্যতার

অবসরেই তাঁর চিত্তে যেসব সমাজ-অভিঘাত অনিবার্যভাবে চিহ্নিত হয়েছে তার উল্লেখ করছি মাত্র। আমরা আশ্চর্য হই যে তাঁর তখনকার সমীক্ষকদলের কেউ এদিকে অবহিত হন নি। কবির সমাজচেতনা-মূলক অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ- ভাষণের সঙ্গে তাঁর কবিকর্ম মিলিয়ে দেখেন নি এবং গ্রাম-সংগঠনের আদান্ত প্রসারিত উদ্‌যোগের দিকটিও লক্ষ্যের বাইরে রেখেছেন।

কবির প্রকৃত সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক স্‌ফূর্তি হিসাবে তাঁর কুড়ি-বাইশ বয়ঃক্রমকে চিহ্নিত করলে বোধ হয় খুব অবাস্তব হবে না। এই সময়কার ' নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় তাঁর অজ্ঞাতসারেই সমাজ-বিদ্রোহ বাণীরূপ নিয়েছে 'ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা' প্রভৃতির মধ্যে, তরুণ কবির মগ্নচৈতন্যের স্‌ফুরণে। কবির পূর্ণ-অভিজ্ঞতায় ছিল বাঙালীর জীবনের প্রথা-জর্জর ও কর্মবিমুখ বিমূঢ়তা, যা থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছেন প্রবল বিদ্রোহের সঙ্গে। এই বিদ্রোহ কিছু পরেই আবার দেখা দিয়েছে 'দূরন্ত আশা' কবিতায়, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব-বেদুয়িন' এবং হতভাগ্যের গানে 'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস' এর মধ্যে এবং বর্ষশেষ কবিতার 'সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়' প্রভৃতিতে। এখন এসব আর মগ্নচৈতন্যের ব্যাপার নয়, পরিস্‌ফুট মূর্তি নিয়েছে সমাজ-অভিঘাত হিসাবে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে কবি গ্রামীণ সমাজ পরিস্থিতির, ভূমিসংলগ্ন দুর্বল মানুষগুলির ও হিন্দু- সম্প্রদায়ের মুসলমান- ঘৃণার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন এবং এর প্রতিরোধের বিষয়ও চিন্তা করেছেন, যার ফলে স্বপ্ন পরেই আরম্ভ করেছেন গ্রাম- সংগঠনের কাজ। তাঁর মতে- উন্নয়নমূলক গ্রাম- সমাজ-সংগঠনই প্রকৃত স্বাদেশিকতা, কেবল সভা ও মিছিল করে ইংরেজ শাসননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। এতে একদিকে গ্রামীণ স্বাধীনতায় ইংরেজের হস্তক্ষেপ রোধ করা হবে, আর সেইসঙ্গে ঐকত্রিক কর্মযজ্ঞের সূত্রে জাতিবর্ণ- সম্প্রদায় বিভেদ অনেকটা লঘু হয়ে আসবে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' কবির অজ্ঞাতসারে যা ধরা পড়েছিল তা পরিস্‌ফুট হল প্রত্যক্ষ সমাজ-পরিচয় পেয়ে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার ছন্দোময় বাক্যে এবং আরও নানান্‌ স্থানে। লক্ষণীয় বিষয় হল কবির গ্রাম-সংগঠনের কাজ সম্পর্কে চিন্তার মধ্যেই স্বপ্নলোকে শিপ্রানদীপারে পূর্বজন্মের প্রিয়ার অনুসন্ধান থেকে আরম্ভ করে খেয়া-কাব্যের 'বাতাস থমকে জোনাকি চমকে' এবং 'ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে' প্রভৃতি পার হয়ে গীতাঞ্জলির 'একেলা কোন্‌ পথিক তুমি' প্রভৃতি নিসর্গ-কল্পনার আশ্চর্য মুহূর্তগুলি সমান্তরাল ভাবেই চলেছে। চলেছে পরের অধ্যায়ের বনবাণী এবং নটরাজ-ঋতুরঙ্গের লীলাদর্শনের মধ্য দিয়ে ও পার্থিব বা মহাকাশীয় অজস্র গানে কবিতায়। বস্তুত এই কারণেই রোম্যান্‌টিক গীতিকবি হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের শ্রেষ্ঠতার দাবী করতে পারেন।

তবু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ ধরণের নভঃস্পর্শী নিসর্গ-কল্পনা এবং সেইসঙ্গে সমাজ- বোধ কবিচিত্তে ক্রমশঃ এমনভাবে মিশে গেছে যে একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা যায় না। যেমন বলা যায় যে 'ফাল্গুনী' তে বসন্ত বর্ণনার মধ্যেই সংকেতে সমাজে ও যৌবনে নূতনের বিজয়বার্তা ঘোষণায়। 'রক্তকরবী'তে শ্রমিক-জীবনের শোষণ –মুক্তির সঙ্গে নন্দিনী- চরিত্রের উপস্থাপনে এবং পৌষের ফসল-কাটার গানে। এর সঙ্গে রঞ্জন চরিত্রের প্রতীকী কাব্য-কল্পনা তো আছেই। এই কাবিক পরিবেশের সঙ্গে নাটকটির মূল প্রতিপাদ্য শ্রমিক-নিষ্পেষণ ও তাদের দাসত্বমুক্তি অদ্ভুতভাবে একত্র গ্রথিত হয়েছে। অচলায়তন নাটকেরও মূল প্রতিপাদ্য শাস্ত্র- প্রথার অচলায়তন ভাঙা ও সংগ্রামের দ্বারা হীনবর্ণের চির- নিগৃহীত মানুষের মুক্তি নিয়ে আসা। ডাকঘরে অবরুদ্ধতা থেকে শিশু-কিশোরদের মুক্তি। অথচ এ দু'টি ক্ষেত্রেই নিসর্গের পটভূমি লক্ষণীয় হয়েছে। এইভাবে দেখানো যেতে পারে যে কবি বিশুদ্ধ নিসর্গভাবনাকে সমাজ-ভাবনার সঙ্গে অন্বিত করে দিয়েছেন। কাব্যজীবনের শেষ অধ্যায়েও নিসর্গ- প্রকৃতি আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আর সুদূর-কল্পনার যোগ নেই। পুনশ্চতে খোয়াই এবং কোপাইকে একেবারে বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে কবি দেখেছেন, পৃথিবী-সম্পর্কিত পত্রপুটের বিখ্যাত কবিতাটিতে মানুষের দুঃখ ও সংগ্রামের পোষকতার জন্যই পৃথিবীর মহিমা ঘোষণা করেছেন। একেবারে শেষ জীবনে, 'ঐকতান' কবিতায় তাঁর রোম্যান্টিক নিসর্গ- কল্পনাকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন এবং দরিদ্র মেহনতী মানুষের জীবনের শরিক না হতে পারার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। এইভাবে দেখা যায় কবি পরিবর্তিত হতে হতে নিসর্গ থেকে মানুষের কুটিরদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আত্মদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজজীবন বিষয়ে বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন তাঁর কাব্যজীবনের শেষ অধ্যায়ে। আর প্রথমজীবনে লেখা 'অন্তর্যামী' আখ্যার কবিতাটি তো রয়েছেই। মাটি ও মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর কবি তাঁর নোতুন অভিজ্ঞতার জীবনকে এইভাবে চিহ্নিত করেছিলেন-

কান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।.....
খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ
ধুলায় রৌদ্রে মলিন বরণ – ইত্যাদি।

'শেষ সপ্তকে'র কবিতায় নিসর্গ থেকে সমাজ-ভাবনায় অবস্থান্তরিত হওয়ার বর্ণনা এইভাবে দিচ্ছেন-

বালক ছিলাম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে
ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়।
দিন এগোল।
চলল জীবনযাত্রার রথ
এ-পথে ও পথে।
ক্ষুব্ধ অন্তরের তাপতপ্ত নিঃশ্বাস
শুকনো পাতা ওড়াল দিগন্তে।
চাকার বেগে
বাতাস ধূলায় হল নিবিড়,
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হ'ল ভেরী, খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।

সেঁজুতি কাব্যের 'জন্মদিন' কবিতায় ফ্যাসিস্ট যুদ্ধবাজদের অভিশাপ দিয়ে তিনি ভারী ইতিহাসে মানুষেরই জয় ঘোষণা করেছেন-

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব..... বলে যাব-
দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতাটি কবির অন্তরসত্তার পরিচয় জানার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। এতে কবি জানিয়েছেন তিনি বাউলধর্মী মানুষ। প্রথাগত দেবতায় তাঁর আস্থা নেই। বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই জাতিবর্ণের কৃত্রিম বিভেদে।–

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত। .....
কবি আমি ওদের দলে-
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।.....

লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ , আমার সগোত্র।

কবির এই অকুণ্ঠ আত্মসত্যের ঘোষণায় আর সন্দেহ থাকতে পারে না যে প্রথাগত হিন্দুধর্মের অমানবিকতার বিষয়ে তিনি যেমন বিদ্রোহী, তেমনি তিনি ইতিহাসের পূজারী, যে ইতিহাসের ধারা মানব-অভ্যুদয় নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করছে।

রবীন্দ্র-চিত্তে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

রবীন্দ্রচিত্ত যখন আপন স্বভাবেই পরিবর্তনের পথে, এমন সময় মহাযুদ্ধ এসে তাঁর মধ্যেকার স্থিতিশীলতার সামান্য অবশেষও উড়িয়ে নিয়ে গেল। কবি সুনিশ্চিত উপলব্ধি করলেন যে- " পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা, আর চলিবে না।" মহাযুদ্ধের তূর্যঘোষণার পূর্বেই 'সবুজপত্রে'র প্রকাশ জাতীয় জড়ত্ব ও মধ্যযুগীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রামী করে তুলেছিল। এই সংগ্রামের নিদর্শন সবুজপত্রের মুখবন্ধরূপী 'সবুজের অভিযান' কবিতায়। কবিতাটিতে স্পষ্টতই আমাদের দেশের সনাতনীদের উপর এবং সেকালে অন্ধ সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর প্রবল প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। শিকলদেবীর পূজাবেদী-রূপ অন্ধ প্রথা ও শাস্ত্রের আনুগত্যের বর্ণনা করে, ঘৃণাসহকারে এসবকে দূরে নিক্ষেপ করে, সমাজশাসিত গণ্ডীকে চূর্ণ করে এগিয়ে চলবার জন্য দেহে মনে যারা নবীন তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন কবি। প্রৌঢত্বের সীমায় রবীন্দ্রনাথের এই যৌবনমূর্তির প্রকাশ বিস্ময়কর এবং এখন থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি নিঃশেষে সংস্কারমুক্ত প্রগতিরই পথিক।

রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের মত ভয়ংকরেরও উপাসক। বৃহৎ দুঃখকে, সর্বনাশকে বরণ করার উৎসাহ তাঁর কাব্যের প্রায় সর্বত্র। এর সূত্রে তাঁর জীবনদর্শনেরও বিশিষ্টতার প্রকাশ। তাঁর এই দুঃখপ্রীতি বর্ধিত হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিঘাতে। মহাযুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেছিলেন। এই অর্থে যে, এর আগুনে নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে নোতুন ইয়োরোপ জন্মাবে। সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ ঘটবে। তিনি নিশ্চিত জানতেন এর আগে বুয়র যুদ্ধের সময় উপনিবেশবাদী স্বার্থের যে নগ্ন প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, এ যুদ্ধে তারই বহু ব্যাপক মূর্তি। যুদ্ধারম্ভে অনেকে মনে করেছিলেন যে বৈশ্য ইংরেজ ক্ষত্রিয় জার্মানির হাতে নির্মূল হবে। প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি প্রবন্ধে ভাষিত এরকম ধারণার জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখে জানালেন যে আসল পরিস্থিতি বৈশ্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের নয়। দুইই ধনতন্ত্রবাদী, উপনিবেশবাদী এবং দুইই ক্ষত্রিয় শক্তিতে পরিপুষ্ট। সাম্রাজ্য ভাগাভাগির পালায় জার্মানির অংশে বিশেষ কিছুই পড়ে নাই, তাই তার ক্রোধ। 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে কবির এই পর্যবেক্ষণ –শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ অধ্যয়নের ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। তখনকার দিনে এ ধরনের রাজনীতিক অন্তদৃষ্টি দুর্লভ। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

"সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে। সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তাহার গান্ধর্ববিবাহ ঘটিয়া

গিয়াছে। এক সময়ে জিনিষই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তাহার সম্পত্তি হইয়াছে।..... ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে- তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড় বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর- কখনো ছিল না। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। এখন মুশকিল হইয়াছে জার্মানির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে, অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তাহার শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে।

.....এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জার্মানির নীতি- প্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্বল, ধর্মের দোহাই তাদের দরকার; যারা প্রবল, তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই, নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট।

.....য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাধিতেছে। কিন্তু জার্মান পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্বে আজ মদের মতো জার্মানিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল, সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জার্মান পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।"

দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ অর্থলোভ বা ধনতান্ত্রিকতা। এই সত্যটিকে হৃদয়ংগম করেও রবীন্দ্রনাথ আরও মূলে যেতে চান। ইউরোপীয় রাষ্ট্রজাতিগুলির চরিত্রের মধ্যেই তিনি বিশ্বজোড়া শোষণ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের মূল অনুভব করেন। আর এই মূল ধরেই তিনি Nationalism এর প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন পরবর্তীকালে। কিন্তু আদর্শবাদী ভাবুক হিসাবে তিনি যাই বলুন সাম্রাজ্যবাদের ধনতান্ত্রিক পশ্চাৎপট রাজনীতি –অর্থনীতিবিৎ না হয়েও তিনি শুধু মনীষার জোরেই ধরেছেন এইটিই বিশেষভাবে দেখার বিষয়। অবশ্য পশ্চিমের পত্রিকাগুলিতে যুদ্ধ নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বের হত তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক ছিল। যুদ্ধের পূর্বে তিনি বিলেত গিয়েই Race-Conflict বা জাতিতে জাতিতে বিরোধ নিয়ে আমেরিকায় একটি বক্তৃতা দেন। তবে বক্তৃতা ইয়োরোপের উপর তেমন আক্রমণাত্মক ছিল না। তবু ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্রের

প্রতিবাদমূলক যে Nationalism বক্তৃতা মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত হয় তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নিন্দাও কম ভোগ করতে হয়নি। Nationalism in India প্রবন্ধের জন্য তিনি স্বদেশেও প্রতিবাদ ও নিন্দা ভোগ করেছিলেন। যাই হোক প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল।

এই যুদ্ধে রবীন্দ্রচিত্তের প্রতিক্রিয়া হল ভাবীকালের প্রত্যাশায় আনন্দ। তাঁর ধারণায় সাম্রাজ্যবাদ নিজেই নিজেকে মারবে। উৎপীড়িত মানুষের মুক্তি ঘটবে তারই সূচনা হয়েছে। এই আশা ও আশ্বাস নিয়ে যুদ্ধারম্ভের ঠিক দু'চার দিন পরেই লেখা বলাকার 'পাড়ি' কবিতা। এই কবিতাটিতে দুর্যোগের মধ্য দিয়ে ইতিহাস-বিধাতার আগমন চিত্রিত হয়েছে, আর চিত্রিত হয়েছে নিগৃহীত মানুষের রূপ। এবং নিঃসংশয় আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে পুঞ্জিত পাপ ইতিহাস-বিধাতা চূর্ণ করে লাঞ্ছিত মানুষকে উদ্ধার করবেন। বলাকার কয়েকটি কবিতায় জনচিত্তকে বীররসে উদ্দীপিত করা হয়েছে। ভাবী যুদ্ধের আভাস যখন ফুটে উঠেছে সাময়িকপত্রাদিতে, তখনই কবি 'সর্বনেশে' এবং 'শঙ্খ' এই দু'টি অমূল্য কবিতা লিখে বিমূঢ় ক্লীব ভারতবাসীকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষকে জাগানোর অর্থ হল এই যে, আমাদের স্বদেশেও পুঞ্জীভূত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অন্ধ প্রথা ও শাস্ত্রের শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। হাজার বছর ধরে নিপীড়িত এবং যন্ত্রচালিত মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় স্বদেশবাসীকেই আহ্বান করে বলা হয়েছে- "দূর হতে কী শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন" প্রভৃতি। কবি বলছেন এ যুদ্ধ অনিবার্য ছিল, কারণ পাপ বহুদিন ধরেই স্তূপীকৃত হয়ে এখন চরমে উঠেছে। কী সেই পাপ ?

" ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি- অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহ্নু অসম্মান।"

কবি বলছেন, ইয়োরোপের মানুষ বীরের মত সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে। তারাই যথার্থ অমৃতের পুত্র। এদিকে আমাদেরও সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত। লাঞ্ছিত মানবসত্তাকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু আমরা জড়ের মত দিন কাটাচ্ছি। ইতিহাস-বিধাতার মহাশঙ্খের আহ্বান অবহেলা করছি। বিষয়টি কবি তাঁর 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালার 'অমৃতের- পুত্র' নামক ভাষণে এই ভাবে উপস্থাপিত করেছেন-

" ইতিহাস – বিধাতা তাই বললেন- নতুন হতে হবে। কামানের গর্জন আজ সেই বাণীই শুনতে পাচ্ছি – নতুন হতে হবে। ..... নিজের প্রতাপকে এমনি করে অভ্রভেদী করে সে দুর্বলকে টিপে তার রক্ত পান করবে এমন কথা কি সে বলতে পারে ? মানুষ মানুষকে খেয়ে বাঁচবে, এই হবে? ইতিহাস-বিধাতা তাই হতে দেবেন? না। তিনি কামানের গর্জনের ধ্বনির ভিতর দিয়ে বলছেন- নতুন হতে হবে। য়ুরোপে নোতুন হবার সেই ডাক উঠেছে।

সেই আহ্বান আমাদের মধ্যে নেই? আমরাই জরাজীর্ণ হয়ে থাকব? ইতিহাস –বিধাতা কি আমাদেরই আশা ত্যাগ করেছেন? দুর্গতির পর দুর্গতি, দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে বলছেন - "না, হয়নি , নতুনকে লাভ অমৃতকে লাভ হয় নি। তুমি যে আবর্জনাস্তূপ জমিয়েছ তা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি অনন্ত প্রাণ, আমায় বিশ্বাস করো। বীরপুত্র দুঃসাহসিক পুত্র সব, বেরিয়ে পড়ো।"

আমাদের দেশের মানুষকেও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রথা ও আচারের শিকল ভাঙতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের যন্ত্র মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করা, এর বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে হবে এই আহ্বান কবি পশ্চিমের কামান গর্জনের মধ্য দিয়ে শুনেছেন। ঐ কথাটি আরও জোর দিয়ে বলছেন পরবর্তী ভাষণ 'যাত্রীর উৎসবে'।–

" সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি ..... সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ায় মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব, মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর- এমন স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন বলে এসেছি। ইতিহাস-বিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না? মানুষ অন্ধ জড় প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে, সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না? .....জাগ্রত হও, জাগ্রত হও। প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখবার চেষ্টা কোরো না। সত্য তাহলে নিদারুণ হয়ে উঠবে, যে লোহার শৃঙ্খলে তার হাতকে বাঁধবে সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়েনি? সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্চ্ছিত হয় নি? সইবে না বন্ধন, বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে।"

" মা মা হিংসীঃ" ভাষণে পুনশ্চ রবীন্দ্রনাথ জড়ত্ব এবং অমানবীয়তা থেকে দেশের উদ্ধার কামনা করেছেন। পশ্চিমের যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র। বলছেন স্বদেশেরই কথা। " আমরা এদেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে তুলছি। এ পাপ কতদিন ধরে জমছে। প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্ছিনে? বহু শতাব্দী ধরে আমরা কি কেবলই মরছি নে? সেই জন্যই তো এই প্রার্থনাঃ মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও, এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও।"

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় উচ্চারিত আর একটি ভাষণ হল 'পাপের মার্জনা।' এতে বলা হয়েছে সুবিধাবাদী মানুষ সহজে জাগতে চায় না। ইতিহাস-বিধাতা জোরপূর্বক তাকে জাগাবেন। পুঞ্জীভূত পাপের মার্জনা হবে রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে, অগ্নিবৃষ্টি দ্বারা।

অতএব রবীন্দ্রনাথ মহাযুদ্ধকে অভ্যর্থনা জানালেন। রবীন্দ্রনাথের স্থির ধারণা ছিল যে মানুষ যখন শুদ্ধির সব পথ বন্ধ করে রাখে তখন রুদ্র-ভয়ংকর সর্বনাশের মধ্য দিয়ে এসে মালিনা থেকে সমাজকে, নিষ্পেষণ থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন। এই ভাবটি 'পাগল' প্রবন্ধে, খেয়ার 'আগমন' কবিতায় এবং 'সুপ্রভাত' কবিতায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের সময়ে তিনি এইভাবে জেগেছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই সৃষ্টিলীলায় রুদ্র-ভয়ংকর সম্বন্ধে আরও নিঃসংশয় হলেন। সৃষ্টির সুন্দর রূপ যেমন সত্য, তেমনই সত্য হল এর দুঃখরূপ- এই জীবন- দর্শন অতঃপর তাঁর উপলব্ধির শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। বলাকার কবিতাগুলিতে তো বটেই, গীতালির বেশ কয়েকটি গানে দুঃখবরণের আনন্দ, ঝটিকা, দুর্যোগ, সর্বনাশের মধ্য দিয়ে অজানাকে বরণ করার উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, যুদ্ধারাম্ভের ঠিক পরেই লেখা- "বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে" এবং পরবর্তী 'আরও কী বাণ তোমার তুণে আছে', 'তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে' 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে', 'এক হাতে ওর কৃপাণ

আছে আর এক হাতে হার' 'যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি' – ইত্যাদি বহু। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যে এই সুরের রচনা খুবই কম। অবশ্য মানবিকতার পক্ষ নিয়ে সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণ সমাজের উপর তীব্র কশাঘাত গীতাঞ্জলি-পর্বে প্রবলভাবেই আছে। পুরানো শাস্ত্র ও প্রথায় অনুবর্তন ও সামাজিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বারংবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলাকার পূর্ব থেকেই। বলাকায় এই মনোভাব সংগ্রামের রূপ নিয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাঙনের সৈনিক তারুণ্যের প্রতি কবির অভিনন্দন। বলাকার ঠিক পরের লেখা 'ফাল্গুনী'তে তাই- যৌবনই সত্য, জরা অসত্য- এই ঘোষণা দিয়েছেন এবং এর পর মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ প্রভৃতিতে কবি অন্যায্য নিষ্ঠুর সমাজ ও রাষ্ট্রের বন্ধন থেকে নিগৃহীত মানুষের মুক্তি বারংবার দাবী করেছেন।

কবির 'বলাকা' ফাল্গুনী'র উত্তরাধিকার নিয়ে কাজী নজরুলের আবির্ভাব। লক্ষণীয় এই যে, এই নবীন কবিকে অভিনন্দিত করতে রবীন্দ্রনাথ বিলম্ব করেন নি। নজরুল রবীন্দ্র-মনোভাবকে অন্তরে বরণ করে একেবারে স্পষ্ট এবং প্রায় মৌখিক ভাষাতেই সমাজের অমানবিক জড়ত্বকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করেন। ক্রমে বিপ্লবী স্বাদেশিকতা এবং যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন আরও স্পষ্টভাবে ও সোচ্চারে ঘোষণা করতে থাকেন। কল্লোল-কালিকলম সংশ্লিষ্ট লেখকেরা যেকালে পশ্চিমা মনস্তত্ত্ব ও ভাষাভঙ্গি সহায়ে রবীন্দ্রপন্থা লঙঘনের অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন পরোক্ষে নজরুলই রবীন্দ্রনাথকে জনচিত্তে গ্রহণীয় ও বরণীয় করে তুলতে চেয়েছেন। মহাযুদ্ধ-পরবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের দ্বারাই স্পষ্টীকৃত হয়ে উঠেছেন।

রাশিয়ার চিঠি'র আগে ও পরে

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বারংবার লিখতে হয় এইজন্য যে, চলিষ্ণু মানবিকতাগুণে ভারতবর্ষে তিনি অনন্য প্রতিম। এ বিষয়ে তাঁর যাবতীয় রচনার মধ্যে রাশিয়ার চিঠি অন্যতম প্রামাণিক দলিল। অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী সোভিয়েত রাষ্ট্রের কার্যকলাপ নিয়ে য়ুরোপেই তখন লেখার সংখ্যা কম, কণ্ঠ রোধ-করা ভারতবর্ষের তো কথাই নেই। রবীন্দ্র-বান্ধব অনেকেরই কাছে সোভিয়েত নিষিদ্ধ ব্রাত্যের দেশ। তখন ওখান থেকে ফিরলে একটা অঙ্গ-প্রয়শ্চিত্তের দরকার হোত। তবু সোভিয়েত কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু যথাযথ তথ্য এবং আশ্চর্য রকমের ভাল খবরও তিনি পেয়েছিলেন কারো কারো কাছ থেকে, রোমারোলাঁ যাদের অন্যতম। ফলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে মস্কোয় হাজির হয়ে বিপ্লবোত্তর সোভিয়তের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়েই তাঁর চিত্তের যে অনুভব ঘটল তাকে এককথায় বলা যায়- অপার বিস্ময়। এই বিস্ময়বোধ থেকেই আন্তরিকতার অতুলনীয় রাশিয়ার চিঠিগুলির জন্ম।

একদিক থেকে দেখলে বলশেভিক বিপ্লবের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই কবি স্বদেশে সীমিত পরিসরে গ্রামীণ মানুষের বিশেষত কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে নানান প্ল্যান নিয়েছিলেন। এতে তখনকার কালের আধুনিক সমবায়-চিন্তা ও যন্ত্রবিজ্ঞান নির্ভরতাও স্থান পেয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ যে ক্ষাত্রশক্তি-বৈশ্যশক্তির কলহ নয়, ধনতান্ত্রিক পক্ষের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার সংগ্রাম এও তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা যে নিছক স্বাদেশিক নয়, পরন্তু আন্তর্জাতিক তাও তিনি ঠিক ধরেছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পরেই ওর তাত্ত্বিক ও আর্থনীতিক মৌল স্বরূপ সোভিয়েতের বাইরে খুব কম লোকেরই অধিগত ছিল, ভারতে তা আরও কম ছিল বললেই চলে, তার উপর প্রকৃত সংবাদে ইংরেজের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রচুর। কেবল এটুকু জানা গিয়েছিল যে ওদেশে শ্রমিক বিপ্লব হয়ে গেছে, শাসনদণ্ড এখন কর্মী সাধারণ মানুষের হাতে। এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুর সংকেত ধ্বনিত হয়েছে। এরই ফলে বিপ্লবী মনোভাবের পোষক বিজলী, ধূমকেতু, লাঙ্গল পত্রিকা ও নজরুলের প্রকাশ এবং পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ দু'একজনের ক্বচিৎ কমিউনিস্ট সপক্ষতা। আর রবীন্দ্রনাথ যদিচ 'বলাকার'র সময় থেকেই কবিতায় ও 'শান্তিনিকেতন ' ভাষণমালায় সংগ্রামের

মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের শুভসূচনা অনুভব করে আসছিলেন, একমাত্র বলশেভিক বিপ্লবের দু' তিন বৎসর যাবার পর থেকে ধনতন্ত্রে মজুরির স্বরূপ বিষয়ে বক্তব্য বলতে লাগলেন। যদিও বিপ্লবের বা শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তা না ক'রে সামবায়িকতা ধর্মের প্রসারেই ধনতন্ত্রের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর মিলবে এমন বিবেচনা করলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ভাবনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর জীবৎকালে পৃথিবীতে যেসব উল্লেখ্য সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বৈজ্ঞানিক ব্যাপার ঘটেছে তা কোন না কোন আকারে তাঁর চৈতন্যকে অধিকার করেছে ও রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিশেষভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে তাঁর লেখায় নিছক নিসর্গস্বপ্ন ও আকাশকুসুম প্রবণতা কমে এসেছে, আর তার স্থান দখল করেছে মানুষ-সমাজ। ফাল্‌গুনী, বসন্ত, নবীন প্রভৃতি ঋতুনাট্যেও সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ই ব্যঞ্জিত হয়েছে। মহাযুদ্ধশেষে কবি মার্কিন দেশ ঘুরে এলেন, রাষ্ট্রসংঘের ক্রিয়াকলাপের সারমর্ম গ্রহণ করলেন, স্বদেশের ধর্মসংস্কার-জড়িত অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ দেখলেন। স্বদেশী আন্দোলনের নেতিধর্মের প্রতিবাদে ও ইতিবাচক গ্রাম-সংগঠনের, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক পাপ দূর করার জন্য একের পর এক প্রবন্ধ লিখে চললেন। প্রবন্ধ হ'ল চিন্তা ও মননের প্রকাশ। সাহিত্যিক মর্মের অধিকার প্রবন্ধ ঠিক দাবি করতে পারে না, যেমন পারে কবিতা গান নাটক এমন কি অন্তরঙ্গ চিঠিপত্র। এখন থেকে অর্থাৎ ১৯২২-২৩ থেকে বিশ্বপরিস্থিতি নোতুন করে কবির মর্ম অধিকার করেছে দেখি। তাই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর পীড়নের বিষয়টি মূর্ত হয়েছে 'মুক্তধারা'য়, আর , কল-কারখানা-সহায় সামগ্রিক ধনতান্ত্রিকটার অমানবীয় শোষণ রূপ নিয়েছে 'রক্তকরবী'তে। কাব্য কবিতার মতই এ দুটি নাটক কবির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ রচনা। আর বিশ্বের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক পরিস্থিতির প্রতি কবির সদ্য-জাগ্রত চৈতন্যেরও দলিল। তবে এই সঙ্গে এইটুকু বুঝে রাখা ভাল যে কবি সাহিত্যিক যত বড়ই হোন না কেন, তাঁর কাছে রাজনীতি ও অর্থনীতির একেবারে যথাযথ স্বরূপের পরিচয় প্রত্যাশা করা অন্যায্য হবে। তার উপর যখন তিনি প্রতিক্রিয়াপ্রবণ পরিবেশচক্রের এবং সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অন্তর্ভূত ব্যক্তি। ফলত এরকম পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে সমাজ-চেতনায় যে পরিমাণ অগ্রগতির প্রেরণা আমরা পেয়েছি তাই আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত লাভ, এটুকু না মনে করলেই নয়।

বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের আত্মস্থ হওয়ার প্রারম্ভকালে লেখা হয় রক্তকরবী। বিপ্লবের ভাঙাগড়ার মূল প্রকৃতি এবং খুচরো পরিস্থিতি বাঙলায় অজানা থাকলেও চল্লিশ দস্যু সহ আলিবাবার সঙ্গে সংগ্রামে সাধারণ মানুষের অর্থ্যাৎ কৃষক-প্রজা ও শ্রমিকের অভাবনীয় বিজয় ঘটে গেছে এবং এরা নোতুন উদ্যমে দেশ-সংগঠন আরম্ভ করেছে, এই সাধারণ তথ্যটুকু সকলেরই জানা হয়ে গেছে। এরই সূত্র ধ'রে রক্তকরবীর ক্যাপিট্যালিজম্ অর্থাৎ 'রাজা'র চক্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকের অভ্যুত্থান সংগ্রাম ও সাফল্য চিত্রিত হয়েছে। শ্রেণীসংগ্রামের মূল তত্ত্ব কবির জানা না থাকলেও এবং শ্রমিক বিক্ষোভ খুব সতর্কতার সঙ্গে উপস্থাপিত করা হলেও, কিছু-জানা ও বেশ কিছু না-জানা পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার কবি করেছেন এইটিই লক্ষণীয়। রক্তকরবীকে শ্রেণী সংগ্রামের দলিল ও সোভিয়েত-বিপ্লবের সাংকেতিক প্রতিমূর্তি হিসাবে পূর্ণাঙ্গভাবে চিহ্নিত করা যায় না, এ কথা সত্য। সত্য বিশেষভাবে এই জন্য যে সংগ্রাম ব্যতিরেকেই রাজা বা ক্যাপিট্যালিজম্-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নিজেকে ভেঙে ফেলার আগ্রহ-এটি বস্তুগতভাবে স্বাভাবিক নয়। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এইরকম একটা ইউটোপিয়ান উচ্চাশারই অনুগত ছিলেন, যার জন্য মুক্তধারার ভাবসংকেত ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন যে মারনেওয়ালার ভিতরের মানুষ জাগ্রত হয়ে অত্যাচারের নিস্পত্তি ঘটাবে, আর আমেরিকা-জাপান পরিভ্রমণান্তে লেখা ডায়েরিতে জানিয়েছিলেন-

জড়বস্তুলুব্ধ সঞ্চয়গর্বিত মানুষের নিতান্ত স্বার্থপরতা একদিন নিজেই নিজেকে মারবে। এই প্রসঙ্গেই জেনে রাখা ভাল যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ কাব্য-কবিতায় স্বচ্ছন্দে বরণ করে নিলেও মননমূলক রচনায় এবং বহুজন-প্রেক্ষিত নাট্যে তার অবতারণা করেন নি। সেখানে বরঞ্চ সমবায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির উপরেই জোর দিয়েছেন। রক্তকরবীতে চিত্রিত ক্যাপিট্যালিজম্ এর আর্তনাদ এবং আত্মহত্যার ছবিটি তিনি আগেকার সোস্যালিস্ট্ রবার্ট ওয়েনের দৃষ্টান্ত থেকে হয়ত বা পেয়েছিলেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব মানুন নাই মানুন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ বিষয়ে পরে যতই দ্বিধাগ্রস্ত হোন না কেন, মেহনতী সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের ব্যাপারে যে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলেন, রক্তকরবী তারই প্রমাণ। ধনতান্ত্রিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রবল বিরোধীতা যুদ্ধারম্ভের সময় থেকে (এমন কি তার পূর্বেও) বহু প্রবন্ধে ভাষণে চিঠিপত্রে নানাভাবে

পরিস্‌ফূট হয়েছিল। তবু আমরা রক্তকরবীকেই আরও ঘনিষ্টভাবে ধরছি এইজন্য যে সোভিয়েত কার্যকলাপের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচিত হওয়ার পূর্বে সোভিয়েত একটা বিপ্লবের সাধারণ সংবাদ তাঁর সমাজনিষ্ঠ কবিচিত্তেকে কতদূর উদ্বোধিত করেছিল তার পরিচয় এই নাটক রচনা থেকেই পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র-থিওরির যক্ষরাজ যতই আত্মবিপ্লবী হোন, মেহনতী মানুষের সংগ্রাম ছাড়া নিঃশেষ মুক্তি যে আসে নি এও তো স্পষ্ট।

সুতরাং মস্কো যাত্রার পূর্ব থেকেই রাশিয়ার ব্যাপার দেখার জন্য তাঁর চিত্ত অভ্যন্তরে প্রস্তুত ছিল এবং প্রথম আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পাবার পরই তিনি যে যেতে পারেন নি তার কারণ হল স্বদেশে এবং বিদেশেও সোভিয়েতদের সম্পর্কে উল্টোপাল্টা কথা শোনা। পাঠকরা অবশ্য প্রশ্ন করতে পারেন যে শোষিত মানুষের মুক্তির প্রতিনিধিত্ব করেও এবং রক্তকরবী লেখার পরও তিনি ফ্যাসিস্ত ইতালির সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কে এতটা আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, এমন কি মুসোলিনির শক্তিমত্তার প্রশ্নংসা করেছিলেন কী করে ? এর সহজ উত্তর রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির অতটা ভিতরে প্রবেশ করেন নি। তা ছাড়া দেখতে হবে ইতালির রাজশক্তিকে কব্জা করে প্রজাস্বার্থ রক্ষকের ছদ্মবেশে মুসোলিনির সেই সদ্য আবির্ভাব। মুসোলিনির দমনমূলক কীর্তিকলাপ বিদেশী প্‌ত্র-প্‌ত্রিকার কিছু কিছু সমালোচিত হলেও তখন ভারতবর্ষের কজনই বা সেই এয়াণ্টিথিসিস্‌-এর তত্ত্ব ঠিকমত বুঝেছিলেন ? আরও দেখতে হবে যে 'বিশ্বভারতী'র আদর্শকে কিভাবে বাস্তব ক'রে তোলা যায় সেবিষয়ে কবি ব্যাকুলভাবে নানান্‌ আশ্রয় খুঁজছিলেন। প্রকৃত অবস্থা জানলে তিনি যে সাবধান হতেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, রোলাঁ যখন কবির ঐ অজ্ঞান-নিদ্রা ভাঙলেন আর নিপীড়িত মানুষের কাছ থেকে কবি নিপীড়নের বিষয় শুনলেন তখনই প্রতিবাদ-লিপি পাঠাতে তিনি বিলম্ব করলেন না। এন্‌ড্‌রুজের হাত দিয়ে ম্যান্‌চেস্টার গার্ডিয়ানে পাঠানো ঐ পত্রটি ভুলের জন্য তাঁর আত্মপ্রতিবাদ-লিপিও বটে। এইভাবে বলা যায় যে কবির চিত্ত যথার্থভাবেই শোষিত মানুষের মুক্তির অভিলাষী বহু পূর্ব থেকেই ছিল এবং সে ইচ্ছা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। তবু সোভিয়েত পরিদর্শনে তিনি যেভাবে বিস্ময়মিশ্র প্রশংসার উচ্ছাসিত হলেন তাতে এই বোঝা যায় যে এই নোতুন দেশ তাঁর কল্পনামূলক প্রত্যাশাকে বহুদূর অতিক্রম করেছিল, আর সে ব্যাপারে উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেন নি। যেমন,

".....একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ায় প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষে চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। ..... অতএব রাশিয়ার গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এরকম আশা করা অন্যায় মনে হত। কীই বা জানি, কীই বা দেখেছি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে। আমাদের দুঃখী-দেশে-লালিত অতি দুর্বল আশা নিয়েই রাশিয়ার গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।" পুনশ্চ "জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহুকোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। .....যখন শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু ক'রে এগিয়ে চলেছে, আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা- কেবলমাত্র মাথা-গুণতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ ক'রে বাড়ী চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম..." ইত্যাদি।

'রাশিয়ার চিঠি' কেবলমাত্র সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা এবং কৃষির উন্নয়নের বিবরণ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখকের বাস্তব মানুষপ্রীতি, চিন্তানায়ক ও কর্মীর স্বকীয় গ্রাম-সংগঠনের সাফল্য- অসাফল্য নিয়ে আক্ষেপ, আর সেই সঙ্গে স্বদেশের পরাধীন অবস্থার সকরুণ পরিচয়। বস্তুত পত্ররীতিতে একান্ত আন্তরিকতায় মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পাওয়ায় চিঠিগুলি যেমন আকর্ষণীয় হয়েছে, তেমনি বিন্যস্ত বিষয়গুলির প্রমাণমূল্যও গেছে বেড়ে। এই চিঠিগুলি থেকে পাঠকের উপরি -পাওনা হল- একালের শ্রেষ্ঠ কবির মানসিক প্রবণতার যথাযথ পরিচয়। দেখতে হবে, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে সেই প্রথম সোভিয়েত কার্যকলাপ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণিক ইতিবৃত্ত, আর তা শ্রেষ্ঠ মনস্বীর কলমে। আমার মনে হয়, এই প্ত্রগুচ্ছ টীকা ব্যাখ্যা সমন্বিত হয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। সে সময় ও সামর্থ্য বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের নেই। অতএব, সংক্ষেপে একটা পরিচয় ও কিছু মন্তব্যের পালা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম চিঠিটি কবির মস্কো পৌঁছানর (১১ই সেপ্ট, ১৯৩০) নদিন পরে লেখা। বক্তব্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লাঞ্ছিত দাস-মানুষের স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠালাভ। এ বিষয়ে প্রধান হাতিয়ারের কাজ করেছে শিক্ষা, বিজ্ঞান-সহায় শিক্ষা, যা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত। দ্বিতীয় পত্র। বক্তব্য, 'ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব' । আর এরই জন্য দরিদ্রতম মানুষ, 'চাষাভুষো সকলেই আজ

অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে'। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে। তৃতীয় পত্র। " এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে"। "হাজার বছরের বিরুদ্ধের দশ – পনেরো বছরে জিতবে বলে পণ করেছে। ..... এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।" "ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রঙ্গণদ্ধারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তি সাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্য আমি যাব না তো কে যাবে।" "না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত"- এইভাবে সোভিয়েত পরিভ্রমণের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন প্রশান্ত মহলানবিশকে লেখা এই তৃতীয় পত্রে। চতুর্থ পত্র। রাশিয়া-দর্শন কিভাবে কবির স্বদেশের মেহনতী মানুষের কথা ভাবিয়েছে, কৃষক ও কৃষির জন্য নিজ সীমিত পরিসরে তিনি কী করেছিলেন, আর স্বাদেশিকদের সহায়তা পেলে কী করা যেতে পারত সেই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সমবায় নীতির অনুসরণে বহু জমিকে একত্র করে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ-এ বুদ্ধি তাঁরই বহু পূর্বেকার, আর জমির স্বত্ব জমিদারের নয়, যে চাষ করে তার-এ বিবেচনাও তাঁর আগেকার দিনের। রাশিয়া পরিদর্শনের ফলে ঐসব ভাবনা নতুন করে উদ্ধোধিত হয়েছে। আর চাষী মজুরদের মনুষ্যত্বে উন্নয়ন দেখে তাঁর মনে হয়েছে- 'আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। পঞ্চম পত্র। কৃষক ও কৃষি। বিভিন্ন উপজাতীয় কৃষক নারী-পুরুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ। সমবেত প্রথায় চাষে চাষীদের নানান্ সুবিধা, ওরা এতে সুখী। স্ট্যালিনের উদ্দেশ্য ছিল জবরদস্তি Collectivism নয়, 'সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ'। কর্মচারীদের বিষয়টি ভালোভাবে অধিগত না থাকার জন্যে প্রথম প্রথম কারো কারো অসুবিধে মনে হয়েছিল, পরে প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। কারণ, এতে আহার্য, স্বাস্থ্য, সন্তান- পালন প্রভৃতি সমস্যা সহজ সমাধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি খুঁটিয়ে জানতে চেয়ে দেখলেন যে তখনও কারো কারো ঔদাসীন্য বা অসম্মতি রয়েছে। তাতে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে মানুষের সহজ স্বভাব এই, সে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হাতছাড়া করতে চায় না, যেহেতু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজেকে খুশিমত প্রকাশ করার একটা উপায়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বে চিন্তিত মনোভাব ব্যক্ত করেছেন –'ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে।' ষষ্ঠ পত্র। সোভিয়েত দেশ শিক্ষা ব্যাপারটাকে কিভাবে মানুষের প্রাণ মনের সঙ্গে একাত্ম করেছে, কেবল পরীক্ষা পাসের পর্যায়ে রাখিনি, তার ইতিবৃত্ত। প্রত্যক্ষ্য জ্ঞানের জন্য কবির 'পায়োনিয়ারস্

কমিউনে' গমন, নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা এবং কৃষি শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশ উপবাসের ক্লেশ স্বীকার করছে, য়ুরোপের অন্যান্য দেশকে পেটের খাবার বিক্রয় করছে নগদ টাকায়। সারা দেশ তপস্যায় প্রবৃত্ত। হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম ভ্রমণ। থিয়েটার দেখা, ছবি-আঁকা, সাহিত্য ও আর্টের চর্চা, বিজ্ঞান-ভূগোল শিক্ষার সঙ্গে একত্রগামী। ছবি আঁকার স্কুলের ছাত্রদের হাত প্রশংসনীয়। সপ্তম পত্র। ব্যক্তির শিক্ষা, ব্যক্তির লাভের ব্যাপার এখানে নেই । যা হচ্ছে তা সর্বসাধারণের। ব্যক্তির চিত্তও অনায়াসে সর্বসাধারণের হয়ে পড়েছে। মানুষের ঐক্যই সত্য, বিভেদ সত্য নয়। সারা দেশময় দেশজ্ঞানমূলক শিক্ষার বিরাট পর্ব। স্থান ও মানুষের তথ্যানুসন্ধান। মিউজিয়াম। চিত্রশিল্প। এসব দেখতে আসে কৃষক-শ্রমিকের দল। তাদের খুঁটিনাটি সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়, ছবির সৌন্দর্য কোথায় তা শেখানো হয়। ললিতকলার সঙ্গে নবনাট্যকলারও উন্নতিবিধান সমানভাবে চলেছে। সমাজবিপ্লব সাহিত্যে ও চারুকলায় পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। বিস্ময়ের বিষয়, পুরাতন রাষ্ট্রে ধর্মতন্ত্রের মোহজালে মানুষকে আবদ্ধ করে তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটতে দেওয়া হয়নি। ধর্মমোহ থেকে মুক্ত হতেই তাদের মন প্রাণ বুদ্ধি অবারিত হয়ে পড়েছে। সোভিয়েতরা রুশ সম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে। ধর্ম মোহের থেকে নাস্তিকতা অনেক ভাল। অষ্টম পত্র। রাশিয়ার শিক্ষার জাদু। জারের আমলের রাশিয়ার পুরাতন অবস্থা, যা কতকটা ভারতবর্ষেরই মত, তার বর্ণনা এবং পরে যে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে বৈপরীত্যে তার তুলনা। স্বদেশের অবস্থা। সবচেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার বিষয় এই যে কর্তৃপক্ষে প্রসাদলালিত স্বদেশী জীবরাই মানুষের উন্নয়নে সব চেয়ে বাধা দিয়েছে। নবম পত্র। "সোভিয়েতরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার- বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্য মানবজীবনে যা কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।" ইত্যাদি।

সোভিয়েত পরিদর্শনে কবির মতামত বিষয়ে আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোনো প্রাচীন বা আধুনিক রাষ্ট্র-দেশ সম্পর্কে কোনো পর্যটকের মন্তব্যই এত উচ্ছ্বসিত নয়। অথচ সোভিয়েত যাত্রার পূর্বে কবি সোভিয়েত বিষয়ে বিরুদ্ধ কথাও যথেষ্ট শুনেছিলেন, এ তাঁর উক্তি থেকেই বোঝা যায়। তা ছাড়া বিপ্লব বিষয়ে কবির আন্তরিক সমর্থন থাকলেও, রাষ্ট্রশাসন নিয়ে স্বকীয় মানসেরই বিমুখতা স্বভাবিক ছিল। অর্থাৎ যে পরিবেশে তাঁর মানসিক সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাতে প্রশাসনিক যে কোন জবরদস্তি বিষয়ে তাঁর বিমুখ হওয়ার কথা, আর সেরকম বিমুখতা তিনি অল্প-স্বল্প প্রকাশও করেছেন। তবু, বলশেভিক উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে গ্রামসংগঠন বিষয়ে তাঁর আগেকার ভাবনার ও সীমিত নিজ উদ্‌যোগের মিল দেখে এবং এখানে সেইসব উদ্‌যোগের অকল্পনীয় পূর্ণাঙ্গ মূর্তি প্রকাশ লক্ষ্য করে তিনি বিস্ময় চাপতে পারেন নি এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। যে মুখ্য ব্যাপারগুলি তাঁকে এত আকর্ষণ করেছিল, ক্রম অনুসারে তা এই ঃ

(১)শোষিত পদদলিত দাস্যজীবী মানুষের পূর্ণ মর্যাদালাভ (২) যথার্থ শিক্ষার দেশজোড়া ব্যাপ্তি (৩) বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃষির উন্নতি। এগুলি মধ্যে আবার শিক্ষাবিষয়ক উদ্‌যোগের প্রকারটি প্রায় প্রতিটি পত্রে উচ্চারিত হয়েছে। শিক্ষায় বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্য এবং ললিতকলার অধিকারও প্রায় সমানভাবে স্বীকৃত দেখে কবি আরও উৎসাহিত হয়েছেন। লক্ষণীয় এই যে , বহুদেশদর্শী রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর আর কোনো উল্লেখ্য দেশ স ম্পর্কে এরকম অন্তরঙ্গ স্বীকৃতির এক দশমাংশও প্রকাশ করেছেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থার সাম্য অনুভব ক'রে পরে বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতির সঙ্গে স্বদেশের অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনাও রাশিয়ার চিঠিগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কী হয়েছে আর কী হতে পারত-দেশ সম্পর্কে এই দুঃখজনক ভাবনা। এই প্রসঙ্গ কবি অনিবার্যভাবে ইংরেজ শাসনের উল্লেখ ও ভারতবর্ষ বিষয়ে ইংরেজের ঔদাসীন্যের বিষয়ও জানিয়েছেন। অথচ ঐসব মূল্যবান প্রশংসা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে ঐ ধরণের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যে একটি সংগঠিত বিপ্লবের ভূমিকা অনিবার্য ছিল, এই নিতান্ত সামান্য উপলব্ধিটির প্রকাশ কবির চিঠিতে কোথাও নেই। এমন কি সাম্রাজ্যবাদীদের হটানোর প্রয়োজনীয়তাও কবি উপলব্ধি করছেন না। তাহলে কি এই বুঝতে হবে যে রক্তক্ষয়ী বাস্তব সংগ্রাম কবি চান না ? অথচ বিপ্লবের ফলটা

হাতে আসুক এমন আকাশকুসুম চিন্তা করেন ? দেশীয় রাজনীতিকেরা কি এতই অশ্রদ্ধেয় এবং ইংরেজ-চরিত্র মূলে কি এতই ভালো যে তাদেরই উপর কালক্রমে সোভিয়েত-সদৃশ উন্নয়নের জন্য নির্ভর করা যেতে পারত ?

'রাশিয়ার চিঠি'র সমূহ অসংগতি এখানেই। এখানেই তার যা-কিছু ত্র ুটি ; কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের প্রশ্নে নয়, একনায়কতন্ত্রে সন্দেহও তেমন নয়। বলশেভিকদের আনা ঐসব আশ্চর্য উন্নয়ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে চিন্তা লেখকের পক্ষে যেমন অনিবার্য হয়েছে তেমনি অনিবার্য ছিল বিপ্লব চিন্তা, বিপ্লব ছাড়া ভারতের গতি নেই- এই সত্যটুকু স্বীকার। স্পষ্টতই দেখা যায় কাব্য-কবিতায় সংগ্রাম ও সংঘাতের বাণীর বাহক কবি তাঁর প্রবন্ধে নিছক সংস্কারবাদীর ভূমিকা পরিগ্রহ করেছেন- 'সমবায়নীতি'। কবিকে যদি কেউ প্রশ্ন করত (এবং সে প্রশ্ন তাঁর পরিচিত গোষ্ঠীর কেউই করে নি, কারণ তাদের ওরকম ভাবাই গুরুতর নীতিবিরোধী) যে আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো ভারতের একদিকে কঘন্য সামন্ততান্ত্রিক শোষণ আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী বা অন্য ভাষায় ধনতান্ত্রিকটার এই আক্রমণ, এই দুটি ব্যাপার ভালোভাবে জেনেশুনেও এবং তার ভয়ংকরতার ও ঘৃণার্হতার প্রচুর বর্ণনা সহ নিজে প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও আপনি মননমূলক প্রবন্ধগুলিতে অনিবার্য বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভব কেন করছেন না- তাহলে কবিকে নিঃসন্দেহে থতমত খেতে হত। বস্তুত রাশিয়া-পরিদর্শনে যে সিদ্ধান্ত বালকের পক্ষেও স্বাভাবিক ছিল রবীন্দ্রনাথে তার অবিদ্যমানতা দেখি, এবং তার পরেও প্রবন্ধকারে বিন্যস্ত রাজনীতিক চিন্তায় তা দেখা যায় না। এইটিই 'রাশিয়ার চিঠি'র গুরুতর ত্রুটি-ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণের সপক্ষতাও নয়, শিক্ষার ছাঁচ বানিয়েছে এরকম অভিযোগেও নয়, আর মেহনতী মানুষের ডিকটেরশিপের বিরুদ্ধতাতেও তেমন নয়। রাশিয়ার চিঠি প্রতিশ্রুতিহীন অসমগ্র রচনা। জলস্পর্শ না ক'রে অবগাহন স্নানের পরামর্শ বাক্যে পূর্ণ। অবশ্য কেবল মাত্র একটা জায়গায়। তারই যুক্তির খপ্পরে জেন খানিকটা বেকায়দায় পড়ে কবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বিপ্লব ছাড়া ওরকম দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিংসার পথ আর কীই বা ছিল (উপসংহার দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ স্বীকৃতি জোরের সঙ্গে নয়, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং সম্ভবত অন্যের মূখ রক্ষা করার তাগিদেও হয়ত বা। নইলে পরক্ষণেই, ঐ স্বীকৃতির সঙ্গেই তিনি অনর্থক একথা জুড়ে দিতে পারতেন না যে ঐরকম একনায়কতা স্থায়ী হলে অমঙ্গল। কবি, হয়, ফ্যাসিস্ত একনায়কতার সঙ্গে মেহনতী মানুষের

নায়কতার (যা ঐ একনায়কতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু) মৌলিক প্রভেদ বুঝতে পারেন নি, নয়, ইংরেজের ক্রোধকে ভয় করেছেন, নয় অন্যের দ্বারা চালিত হয়েছেন। দেখতে হবে ঐ 'উপংহার' অংশ মস্কো দেখার বেশ কিছু পরে লেখা আর ওর ইংরেজি অনুবাদ মডার্ণ রিভিউয়ে প্রকাশিত হলে পর বাঙলার গভনর ঐ সংখ্যার প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ওতে ইংরেজ সরকারের শাসন ব্যবস্থার সামান্য সমালোচনা ছিল, এই অপরাধ। তাই যদি হয় তাহলে কবি রাশিয়ার চিঠির নানা স্থানে স্বদেশের ঐ রকম শিক্ষা, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য পরোক্ষ ইংরেজের শোষক চিত্তের উদ্বোধন কোন্ যুক্তিতে ঘটাতে চান ? এমন কি, এতদূর প্রত্যাশা করতেও সংকোচ বোধ করছেন না যে "কতবার আমি ভেবেছি, আমাদের দেশে সাইমন কমিশনের যাবার আগে একবার রাশিয়ার তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।" বস্তুত রবীন্দ্রনাথ সমাজ ভাবনায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা অন্যদিকে ইংরেজের চারিত্র্যে প্রবল আস্থা, কবিতায় সংগ্রামের আহ্বান কিন্তু প্রবন্ধে সংগঠন ও সহযোগিতার পরামর্শ, অসহযোগের বিপক্ষতা ও সপক্ষতা, এই রকম দ্বৈতচক্রেই আদ্যন্ত আবর্তিত হয়েছেন। 'রাশিয়ার চিঠি'কে যদি চৌদ্দ পর্বের ক্ষুদ্রকায় "মানুষের পাঁচালী" গ্রন্থ মনে করা যায়, ফ্লশ্রুতিতে পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ হয় না।

লেখকের বিপক্ষে উপ্রের সমালোচনা খুবই যুক্তিসংগত সন্দেহ নেই। কিন্তু ফলাকাঙক্ষা বাদ দিয়ে দেখলে সোভিয়েত কর্মনীতির এই অকুণ্ঠ প্রশস্তি বাঙালীর তথা ভারতবাসীর চিত্তকে প্রগতিমুখী করতে সহায়তাও করেছে যথেষ্ট। সংগ্রামী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ছাড়া কেবল জোড়াতালি সংস্কারে এ দেশে মানুষের মুক্তি হাজার বছরেও আসবে না। আজ এমন যদি মনে করা যায়, তবু সেদিনকার পরিস্থিতি ও পরিবেশে বিচারে রবীন্দ্রনাথের মত মুখ্যত সাহিত্যিকের কাছে যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট মনে করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিগত রাষ্ট্র-দার্শনিক কখনোই ছিলেন না, কিন্তু নিঃসন্দেহে মানবমুক্তিকামী ছিলেন, সামন্ততান্ত্রিক ধর্মমোহ ও বিভেদনীতির প্রবলতম বিরোধী ছিলেন; পুরাতনকে ভেঙে নতুনের জয়যাত্রা বিষয়ে বারংবার আমাদের চিত্ত উদ্বোধিত করেছিলেন, ফলে ভাবমূলক স্বাদেশিকতার তাঁর একটা স্থানও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এ সত্যটুকু আমাদের স্বীকার করতে হবে, আর মনে রাখতে হবে যে তাঁর আন্তর্জাতিক মানবীয়তা সেকালের স্বদেশিকদের উদ্‌বুদ্ধ করতে অক্ষম হলেও একালে তার প্রয়োজন অনিবার্যভাবে

সকলকেই স্বীকার করতে হচ্ছে। এবার রাশিয়া দর্শনের অভিজ্ঞতা কবি-মনীষীর পরবর্তী সাহিত্য ও সমাজ ভাবনার কোন রেখাপাত করেছে কিনা তাও দেখা যেতে পারে। প্রায় বছর দুই পরে লেখা 'রথের রাশি' বা 'কালের যাত্রা' নাটিকায় কবি কালোচিত শূদ্র আধিপত্যকে স্বীকার করেছেন দেখি। যদিও রাশিয়ার চিঠির উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় আত্যন্তিক স্থায়ীভাবে এখানেও ঐ ব্যাপারটিকে নিঃশেষে মেনে নিতে পারেন নি। ভূমিকায় কবির বক্তব্য- "এই সম্বন্ধের (অর্থাৎ মানুষে মানুষে ঐক্যের সহজ বিকাশের-লেখক) অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" প্রসঙ্গক্রমে এখানে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে ঐ সম্বন্ধ কি কেবল সামাজিক ব্যাপার নিয়ে, না সেই সঙ্গে আর্থনীতিক সাম্য নিয়েও। যদি প্রথমটিই কবির অভিপ্রেত হয় তাহলে গীতাঞ্জলির 'অপমান' কবিতায় এবং কালান্তরের প্রবন্ধনিচয়ে তো পূবে'ই সেকথা ভালো ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে, এমন কি 'অচলায়তন' নাটকেও ; আর যদি রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়ে নির্যাতিত মানুষের অর্থনৈতিক শোষণ –মুক্তির বিষয়টি অর্থাৎ শ্রেণীশোষণ তিনি অধিগত করতে না পেরে থাকেন তাহলে পরে কোনকালেই সাহিত্যে তার প্রতিফলন প্রত্যাশা করা যায় না। তা হয়ও নি। 'তাসের দেশে'র উপসংহারে ভাঙনের গান যুক্ত হলেও বিষয়টি সাধারণভাবে স্বদেশের জড়ত্ব মোচনের। যুদ্ধবিরোধী মনোভাব নিয়ে লেখা কবিতাগুলি চিরন্তন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার। অবশ্য ফ্যাসিবিরোধ হিসাবে তৎকালীন সোভিয়েত মনোভাবের সঙ্গে এর মিল এসে গেছে, কিন্তু কবি যে অন্যায় বিধ্বংসী গ্লানি মোচনের সহায়ক যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন, তার প্রমাণ রয়ে গেছে বরঞ্চ তার পূর্বেকার লেখায়, প্রথম মহাজুদ্ধকালে তাঁর চিত্তের প্রতিঘাতে। একমাত্র বলা যেতে পারে যে সোভিয়েত কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখার পর শ্রীনিকেতনের গ্রাম সংগঠন ও মানুষ-উন্নয়নে কবি আরও অবহিত হয়েছিলেন, শোষিত মানুষের বিষয়ে কবি হয়ত বা আরও বাস্তব প্রতিকারের অভিমুখী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ ও 'পল্লীপ্রকৃতি' পুস্তিকা কিছুটা প্রমাণ। বস্তুত রোমা রোলাঁর ঘনিষ্ঠ স ম্পর্ক এবং মস্কো অবস্থানে কবির দৃষ্টি বর্তমান সমস্যা বিষয়ে তাঁকে পরিচ্ছন্ন বাস্তব চিন্তার অনুগামী হতে সহায়ক হয়েছে, যদিও বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল কিনা সন্দেহ। নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রামের ইতিবৃত্তে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে কবি

প্রবৃদ্ধ হন নি। তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যাই হোক, ‘রাশিয়ার চিঠি’ আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকে সাম্যবাদের দিকে নিয়ে যেতে অবশ্যই কিছুটা সহায়তা করেছে, আর সোভিয়েত দেশ, অন্তত কর্ম-উদ্‌যোগের দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কবি এবং উল্লেখযোগ্য চিন্তানায়কের সমর্থন পেয়ে বিশ্বের মেহনতি মানুষের-একাত্মকরণে বেশকিছু পরিমাণে উৎসাহিতও হয়েছিল, এ সত্যও মানতে হবে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য কি আজও প্রাসঙ্গিক ?

'প্রসঙ্গ' শব্দটার বহু অর্থের মধ্যে একটা হল 'সংগতি, সম্পর্ক'। ঐ অর্থের সূত্রই রবীন্দ্র-লিখনের কালিক যৌক্তিকতা বিচার্য কিন্তু তার আগে দেখতে হয় যে উক্ত বিষয় উত্থাপনের মূলে ধরে নেওয়া হয়েছে- আমরা নোতুন কালে পদক্ষেপ করেছি, ষাট-সত্তর-আশি বছর আগেকার সেকাল এখন কালবারিত। এখনকার আমাদের চিন্তা-ভাবনা-স্বপ্ন নোতুন পথ নিয়েছে, কারণ, বাস্তবে নোতুন সমাজ ও জীবনকে আমরা পেয়ে গেছি, অন্তত তার অভিমুখীন হয়েছি। কিভাবে ? তা দেখতে গিয়ে নোতুনের সমর্থকেরা নিশ্চয়ই বলবেন যে- আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, ভোট দিয়ে নিজেদের পছন্দমত রাষ্ট্রগঠন করছি। কৃষিতে, বিজ্ঞানে , শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষায়, জীবন-যাপনের মানে আমরা বেশ কিছু উন্নত হয়েছি এবং এমন আশা হচ্ছে যে কিছুকালের মধ্যেই পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে আমরা টেক্কা দিয়ে চলতে পারব ইত্যাদি। এর জবাবে পরপক্ষ হয়তো বলবেন যে ঠিক কথা। আমাদের স্বাদেশিকতা নিয়ে লেখা আগেকার দিনের কবিতা-গল্প-নাটকগুলো আমাদের পাঠ্যতালিকা থেকে না হয় বাদ গেল, এখন দলবাজি নিয়ে, ভোটবাজি নিয়ে, রাজনৈতিক নট-নটীদের লীলা নিয়ে নোতুন সাহিত্য লিখতে হবে, শিল্প-বাণিজ্যের সূত্রে মেশামেশি থেকে পাওয়া পশ্চিমা জীবনের ছবি নিয়ে সিনেমা, টি-ভির আয়োজন তো দেখাই যাচ্ছে, এমন কি নারীরাও বন্ধন মুক্ত বিলাস-জীবনের আগ্রহে অধীর হচ্ছেন, অন্তত অর্থে বলশালী সম্প্রদায়ে, এমনটাও তো প্রত্যক্ষই দেখা যাছে। কিন্তু বাস্তব বহিরঙ্গ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কি তেমন পরিবর্তন পরিস্ফুট হয়েছে, যেমন- নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের মাননে ? ধর্মভেদ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা চলে গেছে ? হিন্দুদের মধ্যেকার জাতপাঁতের শাস্ত্রনীতি বিদায় নিয়েছে বা নেবে এমন আশা দেখা যাচ্ছে ? মেয়েরা কি পছন্দমত বিয়ে করে জীবনে প্রত্যাশিতভাবে সুখী হতে পারছে ? শহরবাসী ও গ্রামবাসী মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনের মানে কি সমতা এসেছে ? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় আমরা কি প্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে যেতে পেরেছি ? এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পুনঃ পুনঃ অনুপ্রেরণা দেওয়া সত্ত্বেও ?

একটা দিক গেল, আর একটা দিক হল আমাদের অন্তর্জীবন। যার অন্তত কতকগুলি ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় কিছু চিরন্তনতা থেকেই যায়, সেগুলো মানসিক স্থায়ীভাব, যা নিয়ে সাহিত্যিকদের মুখ্য কারবার, যেমন- যৌন আকাঙ্ক্ষা বা প্রেম ও তার সঙ্গে যুক্ত বিচিত্র ভাব-তরঙ্গ, নারীদের মাতৃত্ব ও নারী পুরুষের সন্তানপ্রতি, বন্ধুবাৎসল্য ও শত্রু-বিদ্বেষ, দূরাকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাষ, নৈরাশা ও আশাস্বপ্নের মরীচিকা দর্শন, অলস স্বপ্নে আসক্তি প্রভৃতি বহুবিধ। সৃষ্টিমধ্যে যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন এগুলো অপরিবর্তনীয় এমন বলা যায়। কাল যতই বদলে যাক, উল্লিখিত স্থায়ী প্রবৃত্তিগুলো নিয়ে তো চিরকালই সাহিত্য লেখা হতে থাকবে, আর তাই নিয়ে প্রাসঙ্গিকতা অপ্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন ওঠাই তো অযৌক্তিক। লেখক ভালো লিখছেন, কি খারাপ লিখছেন সে ভিন্ন কথা। রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বোচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকের সব রচনা সমান মূল্যের নয়, এমন কি ত্রুটিহীনও নয়।

কিন্তু আমাদের আজকের প্রস্তাবিত টপিক্টা একটা পুরানো ব্যাপার। সেই উনিশশ' পঁচিশ-তিরিশের কালের। তখনই মহাসমারোহ সহকারে কতিপয় কবি-গাল্পিক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে রবীন্দ্র-রচনা পুরানো হয়ে গেছে, পুরানো পুঁজি নিয়ে বৃদ্ধটা এখনও কারবার চালাচ্ছেন। যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার স্বরূপটাই পাল্টে গেছে এবং আরও যাচ্ছে। আর উনি উচ্চ মঞ্চে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন আর পুরানো কাসুন্দি চাখছেন। এই নিয়ে কল্লোল, কালিকলম পত্রিকায় তাঁরা ঝড় তুলেছিলেন, রবীন্দ্র-সমর্থকেরাও বিচিত্রা, প্রবাসী, ভারতবর্ষে তার জবাব দিয়ে চলেছিলেন, আর পরিশেষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাতে অল্পস্বল্প যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য, সাহিত্যিক আখ্যাটা তখন খুব চালু হয়েও পড়েছিল, আর ও-পক্ষ থেকে কটাক্ষ করা হয়েছিল রবীন্-ধুত্তোর বলে। ঐ অতি-আধুনিকদের বক্তব্য এই ছিল যে- ঘৃণায় অবহেলায় যাদের পাশ কাটিয়ে এতদিন চলা হয়েছে, সাহিত্যের খোলা হাটে তাদের স্থান দিতে হবে, বিড়িওয়ালা, পানওয়ালী, অন্ধকার গলির খেঁদি পাঁচী সোনামণি-গোলাপীদের বাদ দিলেও চলবে না। প্রেমের কবিতায় বৈজ্ঞানিক যৌন বুভুক্ষাকে অগ্রধিকার দিতে হবে, যুদ্ধোত্তর রুগ্ন মানসিকতা ও হতাশাকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে এবং ভুয়া আদর্শের স্বপ্নসৌধ রচনা করে ভোলানো চলবে না-ইত্যাদি। ভাষা-অলংকারেরও বদল চাই। পানে ,তরে,সাথে, তব, তোমায়, জোছনা, বাঁশরি, ললনা, তিরপিত প্রভৃতি মধ্যযুগীয় শব্দের জায়গায় দিকে, জন্য,

সঙ্গে, তোমাকে, বাঁশি, জ্যোৎস্না প্রভৃতি ব্যবহারিক শব্দ দিতে হবে, প্রতীকী ইমেজ গড়তে হবে এবং উপমানের ক্ষেত্র গুবরে পোকা, ব্যাঙ, গিরগিটি, ভেটকী মাছ প্রভৃতিকে প্রয়োজন বোধে স্থান করে দিতে হবে-ইত্যাদি। বলতে গেলে এসব নির্দেশনামার সারমর্মে হয়তো কিছু সত্য ছিল এবং সব সময়েই তা আছে, কিন্তু বাছাই করে এসবের পক্ষেই অকালতি করতে হবে, এমনটা কি ঠিক ? মহাযুদ্ধের দোহাই দিয়েও।

দেখতে গেলে প্রথম মহাযুদ্ধটা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে যেমন সাংঘাতিক হয়েছিল আমাদের ক্ষেত্রে তার দশমিক আংশিকও নয়। আমাদের দেশে যুদ্ধোত্তর বাস্তবতা বলতে বছর দুয়েকের খাদ্যাভাবে বস্ত্রাভাবে সাধারণ মানুষের কষ্ট, আর ইংরেজ প্রভুদের সর্বনাশ হলে আমাদের কী হবে, জমিদার-বাবুমহলের এই দুর্ভাবনাকে বোঝায়। বস্তুত মহাযুদ্ধের আগে থেকেই যে স্বাদেশিক ও গুপ্ত স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্লায় চলেছিল, যুদ্ধকালের মধ্যেও তাতে কোনো ছেদ ছিল না। যদিও দেশের বেকার তরুণদের অনেকেই যোদ্ধার খাতার নাম লিখিয়েছিলেন ও সুদূর প্রাচ্যে চলে গিয়েছিলেন। মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী প্রবর্তিত নোতুন রীতির স্বদেশী আন্দোলনে সারা ভারত নিমজ্জিত হয়। বলতে গেলে স্বদেশী আন্দোলনই আমাদের যুদ্ধোত্তর বাস্তবতা, আমাদের দেশের নীরব লড়াই, আর এর সঙ্গে আশা-উদ্দীপনা ও সেই সঙ্গে বলশেভিক সাম্যবাদের প্রভাবই তখনকার জাতীয় মানসিকতা, ইয়োরোপীয় সাহিত্যিকদের নকলনবিশি নয়। এই বিষয়টিই ভালোভাবে দেখতে হবে ও বুঝতে হবে এবং সেই সঙ্গে এও বুঝতে হবে যে কতিপয় উন্নাসিক সাহিত্যিকের উচ্চকণ্ঠ প্রচারের ফলে দেশের যথার্থ মানসিকতা বদলে যায় না। ১৯১০-২০-৩০ এর আমরাও স্বাধীনতা নামক একটা ঘটনার পঞ্চশ বছর পরেও বিশেষ বদলে যাইনি। কারণ, স্বাধীনতার প্রত্যাশিত স্বাদ আমরা পাইনি এবং সমাজে বৈষয়িক ছোট-বড় পার্থক্য, সমাজে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়-ভেদ আজও তেমনি দেশকে মসীলিপ্ত করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ কী কাব্যে কী গদ্যে এ সবের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন, যার ফলে আজও তিনি সম্পূর্ণ রূপেই প্রাসঙ্গিক। আর স্বপ্নময় কাব্যিক আবেশের কথা যদি ধরা যায়, সৌন্দর্য ও প্রণয়ে নিরুদ্দেশ স্বপ্নচারণ-এতো মানব সাধারণ চিরদিনের মানসিক বাস্তব। যদিচ কালবিশেষে এ স্বভাবের উচ্চতা নিম্নতা মাত্রা আছে। এখন তা নিম্নমাত্রায় রোম্যান্টিক যুগের মত চড়া অবস্থায় নয়, এটুকু বলা যেতে পারে।

পরিশেষে দেখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের মত মহাকাব্যিক আয়তনের কবি যেমন আমাদের অতীত, ও যেমন তাঁর জীবৎকালের সমান্তরালবর্তী, তেমনি সম্ভাব্য ভবিষ্যতের বহুদূর পর্যন্ত গ্রাস করে বসে আছেন। তাঁর সমকালে আবির্ভূত অন্যান্য কবিরা কাব্যসম্পদে তাঁর সাড়ে সাতাশ ডিগ্রি নিচেই ছিলেন, আর আজ যাঁরা কবিতায় লাইন টেনে চলেছেন, তাঁদের কেউ কেউ দম্ভ সহ আত্মস্তুতি করলেও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই তাঁদের অধিকাংশের রচনা নিহিত থাকবে অথবা প্রথম সংস্করণের পরই মুদ্রিত গ্রন্থ সমাধিস্থ হবে এমনতর দুর্ভাবনায় আমরা কাতর হচ্ছি। সে যাক, সাম্প্রতিকদের নিন্দা করার জন্যই আমরা এ লেখা লিখছি না,বাস্তবে যা হয়, বিদেশেও যা ঘটেছে তারই দৃষ্টান্ত পরিবেশন করছি মাত্র। এখন রবীন্দ্রকাব্য কবিতায় কালোত্তীর্ণতা বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত সমাহরণ করা যাক। গানের বিষয় ধরছি না, সেগুলির জীবন্ততার সাক্ষ্য তো হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। অতএবঃ (১) নিসর্গ নিয়ে ঋতু পর্যায় নিয়ে পৃথিবী নিয়ে কবিতায় ও গানে কবি যে আশ্চর্য চমৎকারের সৃষ্টি করেছেন তার মূল্য কালাতিক্রমী এমনকি চিরস্থায়ী বলেও মনে করা যায়। (২) প্রণয় ও প্রণয়ের সঙ্গে জড়িত অথবা প্রণয়ের অতিরিক্ত নারীমূর্তি-আশ্রিত যে বিরহভাবুকতা কবির কল্পনার ঐশ্বর্য বহন করছে তা মানুষচিত্তরই একটি স্থায়ী ভাবনা। সংগ্রাম ও বাস্তব দ্বান্দ্বিকতা কোনো কালে প্রবল হলে তা স্তিমিত থাকতে পারে, তার বিলোপ কোনো কালেই সম্ভব নয়। মহৎ কবিদের রচনায় কাব্যমূল্য কালগতিকে ওঠা নামা করে মাত্র। (৩) দুঃখ ও বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়াই করে এবং মৃত্যুবরণ করেও এগিয়ে চলার যে প্রেরণা কবি এদেশের অলস, নিরাশ, শাস্ত্রভীত মানুষের চিত্তে সঞ্চার করেছেন তার মূল্য আজও সমানভাবেই চলছে এবং চলবে যতদিন না আমরা অভীপ্সিত সাম্য ও সুখের জীবন না আয়ত্ত করতে পারি। (৪) 'এবার ফিরাও মোরে' থেকে 'ঐকতান' পর্যন্ত লেখা শত কবিতায় কবি নির্যাতিত খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য যে অশ্রুপাত করেছেন তার বাস্তব মূল্য আজও কিছুমাত্র কমে নি। (৫) মহাযুদ্ধের প্রতিঘাতে লেখা বলাকার কবিতা ও তার পরবর্তী অনুরণন কবির যুদ্ধোত্তর বাস্তবতার অক্যট্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমাদের দেশের পক্ষে এটাই সত্য, নকল করা পশ্চিমা রুগ্নতা এবং প্রতীকী ভাষায় তার বিবরণ গ্রন্থন নয়। (৬) কবিচিত্তে বিজ্ঞানের বিশেষে মহাকাশ-বিজ্ঞানের প্রেরণা আজও আমাদের সর্বাধুনিক সম্পদ। আধুনিক অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিককে বিজ্ঞান বরণ করে কল্পনায় ও বাস্তবে এতদূর সঞ্চরণ করতে দেখা যাচ্ছে না। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আধুনিকতম কবি। (৭) কবির

লেখা উপন্যাসগুলি স্থায়ী মূল্য অবশ্য বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পগুলি সাহিত্যিক মূল্যে সর্বকালেই স্থায়ী এমন যাঁরা মনে না করেন তাঁদের সাহিত্যিক বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।